রবীন্দ্রমননে মার্ক্সীয় দর্শন

কল্যাণ কুমার সরকার

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
কান্তিরঞ্জন ঘোষ
প্রকাশ ঃ
পৌষ ১৩৬৭
ডিসেম্বর ১৯৬০
প্রচ্ছদ ঃ
অজয় গুপ্ত
মুদ্রক ঃ
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬ নং, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যাঁরা আমার জীবন লাভের অহংকার
সেই বাবা ও মা-কে
আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস
উৎসর্গ করলাম ।

রবীন্দ্র মননে মার্ক্সীয় দর্শন

এক সময়ে একটি বিতর্ক উঠেছিল এই বিষয়ে যে 'রবীন্দ্রনাথ একজন বুর্জোয়া কবি'।

বলাই বাহুল্য কোন বিষয়ে বিতর্ক ওঠাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, অপিচ স্বাভাবিক। আর একবার যদি বিতর্ক ওঠে তবে বিতর্কিত বিষয়টিই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে থাকে। কারণ তাতেই বিষয়টির উপর প্রয়োজনীয়, কখনও বা প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোকপাত ঘটে, যা বিষয়টিকে ও বিষয়টি কেন্দ্রিক যাবতীয় বিষয়-সমূহকে মর্যাদাপন্ন করে তোলে।

বিতর্কের খাতিরেই তাই প্রশ্ন হল 'রবীন্দ্রনাথ কি বুর্জোয়া কবি ?'

প্রশ্নটির সদুত্তর খুঁজতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রশ্নটির অর্থ উপলব্ধি করতে হবে। 'রবীন্দ্রনাথ' কে ছিলেন পাঠকবর্গের কাছে তা উল্লেখ করা একান্তই নিস্প্রয়োজন মনে করি। আবার একথাও তাদের অবগত করানো আরও বেশী নিস্প্রয়োজন মনে করি যে তিনি ছিলেন একজন কবি, কবিগুরু, কবি-সার্বভৌম। কিন্তু যে কথাটা বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করছি তা হল 'তিনি একজন বুর্জোয়া কবি ছিলেন'—এই বাক্যের 'বুর্জোয়া' শব্দটা। এই শব্দটার অর্থ একটু পরিষ্কার করতে পারলেই রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত হতে পারেন কিনা, অথবা পারলেও কী পরিমাণে পারেন তা অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে।

বলাই বাহুল্য 'মার্ক্সীয় শব্দতত্ত্বের' (Marxian terminology)' একটি বিশেষ শব্দ হল এই 'বুর্জোয়া' কথাটি, যার অর্থ খুব যুক্তি-সংগত কারণেই এখনও সুস্পষ্ট নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের নামের আগে এই বিশেষণটির ব্যবহারও অস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

সাধারণ লোকের কাছে 'বুর্জোয়া' শব্দটা ধনী-বিত্তশালী মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ প্রাচুর্যমণ্ডিত ও (সেই কারণে) বিলাসী মাত্রই বুর্জোয়া। আর বিত্তহীন, খেটে-খাওয়া মানুষই হল সাধারণ মানুষ বা সর্বহারা। 'বুর্জোয়া' ও 'সর্বহারা' মানুষ সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত এই সাধারণ ধারণার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে ধন-সম্পদে ভরপুর ও প্রভাব প্রতি-পত্তিতে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ঠাকুর পরিবারের সন্তান হিসাবে রবীন্দ্রনাথ একজন বুর্জোয়া মানুষই বটেন, 'বুর্জোয়া কবি' কিনা—সেটা অন্য কথা।

একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একথাও সাথে সাথে ঠিক যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোনার চামচ্ মুখে নিয়ে। সেই সময় ঠাকুর পরিবার ধন-সম্পদে, বিত্ত-বৈভবে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল; আর এই খ্যাতির পিছনে মূল ভূমিকা ছিল রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের। তিনি বিত্ত-বৈভবের মধ্যে রাজকীয় জীবন-যাপন করার জন্যই সুখ্যাত 'প্রিন্স' (Prince) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বনামধন্য পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীনেই ঠাকুর পরিবারটি ধন-সম্পদে, নামে-যশে শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অগাধ বিত্ত-বৈভবের মধ্যেও তাঁর ঋষিসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও অকাতরে দান-ধ্যানাদি কাজের জন্য তিনি 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। আর এই মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিত্তশালী পরিবারেই তাঁর

জন্ম ও বিকাশ। ধন-সম্পদের মধ্যেই তার জীবন কেটেছে সেই পরিবারে। অবশ্য ধন-সম্পদের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রাচুর্যমণ্ডিত পরিবেশেরও সান্নিধ্য পেয়েছিলেন গভীরভাবে। বরং ধন-সম্পদের সান্নিধ্যের চেয়ে এই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সান্নিধ্যই তিনি পেয়েছিলেন খুব নিবিড় ক'রে। তুলনায় ধন-সম্পদের সান্নিধ্য তাঁর কাছে ছিল অপেক্ষাকৃত লঘু। তাইতো শৈশব থেকেই তাঁর একটা সংস্কৃতি-পিয়াসী মন গড়ে উঠেছিল।

সে যাই হোক, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথ এক ধনী পরিবারের সন্তান। কিন্তু মনে রাখতেই হবে যে মার্ক্সীয় শব্দতত্ত্বে ধনীমাত্রই 'বুর্জোয়া' নয়, তবে বুর্জোয়া-মাত্রই ধনী হতে পারে। মার্ক্সীয় ধারণা অনুযায়ী ধন বা সম্পদের মালিকানাই বুর্জোয়া মানুষের 'অন্যতম' বৈশিষ্ট্য হলেও 'একমাত্র' বৈশিষ্ট্য অবশ্যই নয়। সুতরাং সম্পদশালী ঠাকুর পরিবারকে বুর্জোয়া পরিবার অথবা সেই পরিবারের সদস্য রবীন্দ্রনাথকে মার্ক্সীয় অর্থে 'বুর্জোয়া' মানুষ বলা যায় কিনা তা মার্ক্সীয় শব্দতত্ত্বের 'বুর্জোয়া' শব্দ সংক্রান্ত ধারণার প্রেক্ষাপটেই বিশ্লেষণ করা একান্ত দরকার।

বুর্জোয়া কাকে বলে ?

মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের (Historical Materialism)[২] প্রেক্ষাপটে মানব সমাজের যে শ্রেণী-ভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে আধুনিক শিল্প-সমৃদ্ধ বুর্জোয়া সমাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের এই যুগ হল 'বুর্জোয়া যুগ' ('The epoch of the bourgeoisie')[৩] ; এই যুগ "সামন্ত সমাজের ধ্বংসের মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে" (It "has sprouted

from the ruins of feudal society")[৪]। আর "এই (বুর্জোয়া) সমাজটি সামগ্রিকভাবে ক্রমশঃ ছুটি বিরাট দ্বন্দ্বমুখী শিবিরে, ছুটি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর বিবদমান বিরাট শ্রেণী: বুর্জোয়া ও সর্বহারাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে" ("Society as a whole is more and more splitting up into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other: Bourgeoisie and Prolctariat.")[৫]

কিন্তু প্রশ্ন হল মার্ক্সীয় তত্ত্বে বুর্জোয়া সমাজের পরিচয় কিসে? অর্থাৎ কিসে চিনব এই সমাজকে? উত্তর হল 'শোষণে'। মার্ক্স লিখেছেন, "এই (বুর্জোয়া) সমাজ শুধুমাত্র নতুন (ছুটি) শ্রেণী ও শোষণের নতুন পরিবেশের…সৃষ্টি করেছে" ("It has but established new classes, new conditions of oppression…")[৬] তিনি দেখিয়েছেন যে এই বুর্জোয়া সমাজে সামন্তযুগীয় অনুন্নত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক উন্নত শিল্প-কারখানা, যার উৎপাদিত উন্নত মানের ব্যাপক পরিমাণ দ্রব্যাদি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে এই যুগে সর্বজনিক বা সাধারণ বিশ্ব-বাজার (Common World Market) গড়ে উঠেছে। অবশ্য তা গড়ে উঠেছে বুর্জোয়াদের প্রয়াসে উদ্ভাবিত আধুনিক সুউন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার কল্যাণেই। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণীটি ক্রমশঃ তার নিজের পুঁজি স্ফীত করে নিতে থাকে, এবং তা করে নিতে থাকে শ্রমিক-শোষণের মধ্য দিয়েই, শ্রমিককে বাড়তি শ্রম করতে বাধ্য করেই, শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিশ্ববাজারে রপ্তানি করেই এবং এর বিনিময়ে অর্জিত উদ্বৃত্তমূল্যের (Surplus value) কোনও অংশ শ্রমিককে না দিয়েই। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজের গতি-প্রকৃতি শ্রমিক-শোষণের মধ্যেই নিহিত আছে।

তাহলে এবারে প্রশ্ন হল বুর্জোয়া শ্রেণী বা বুর্জোয়া মানুষের

পরিচয় কিসে ? কিসে বুঝব কোন্ মানুষ বুর্জোয়া ? ঐ একই উত্তর, সাধারণ মানুষের উপর শোষণ-শাসন আরোপে। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের উপর বঞ্চনা ও শোষণ চালিয়ে যাওয়াই বুর্জোয়া মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common feature)। নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে বুর্জোয়া মানুষেরা নিত্য-নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানে অতিরিক্ত উৎপাদন করার জন্য বাড়তি শ্রম করতে বাধ্য ক'রে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে ক্রমাগত শোষণ করে চলেছে এবং তাকে নিঃস্ব সর্বহারাতে পরিণত করেছে। তাই সাম্যবাদী ইস্তাহারে মার্ক্স-এঙ্গেলস বুর্জোয়া ও সর্বহারার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ঃ—

> বুর্জোয়াশ্রেণী বলতে আধুনিক পুঁজিপতি, সমাজের উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক এবং মজুরী শ্রমিকদের নিয়োগকর্তাদের সমষ্টিকেই বোঝায়। আর সর্বহারাশ্রেণী বলতে আধুনিক মজুরী শ্রমিকদের শ্রেণীকে বোঝায় যারা নিজেদের হাতে উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা না থাকায় বেঁচে থাকার তাগিদে নিজেদের শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।
>
> ["By bourgeoisie is meant the class of modern capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labour. By proletariat, the class of modern wage labowrers, who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labor-power in order to live."] ৭ [The Communist Manefesto]

প্রকৃতপক্ষে, শ্রমজীবীদের শ্রমের মূল্যই বুর্জোয়ারা ক্রমাগতভাবে নিজেদের মূলধনকে স্ফীত করে থাকে। আর শ্রমজীবী মানুষেরা পেটের দায়ে বুর্জোয়াদের কারখানায় শ্রম করতেও বাধ্য থাকে। তাদের শ্রম করার এই বাধ্য-বাধকতার সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়ারা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে তাদের বাড়তি শ্রম করতে বাধ্য করে ; এবং বুর্জোয়াদের ধারাবাহিক শোষণের চাপে পড়ে শ্রমজীবী মানুষেরা যন্ত্র-মানুষে পরিণত হয়ে পড়েছে ; তারা তাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখ, হাসি-আহ্লাদ, আমোদ-প্রমোদ ভুলতে বসেছে : স্নেহ-মায়া-মমতার নিবিড় পারিবারিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বসেছে ; ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চ্চার জগত থেকে নির্বাসিত হতে চলেছে। রুজি-রোজগারের আশায় বুর্জোয়াদের কারখানাতে যন্ত্র-মানুষের মতো তারা শুধু উৎপাদন করেই চলেছে। আর তাদের শ্রমের মূল্যে অর্জিত উৎপাদনের মূলধন বুর্জোয়ারাই ঘরে তুলছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই শোষণমুখী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ লিখেছেন,

> বুর্জোয়া শ্রেণী···সব রকম সামন্তযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক, আদর্শ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছে। এটা···নগ্ন আত্মস্বার্থ, নির্মম 'অর্থ-মজুরী' ছাড়া অন্য কোন বন্ধনই মানুষের মধ্যে রাখেনি। · এটা ব্যক্তিগত দক্ষতাকে বিনিময় মূল্যে পরিণত করেছে এবং···স্বাধীন ব্যবসায় বা অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এক কথায়··· নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ, পাশবিক শোষণের আমদানি করেছে।···এটা চিকিৎসক, আইনজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞান মনা মানুষকে নিজের মজুরী-শ্রমিকে পরিণত করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবারের আবেগানুভূতির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করেছে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে নিছক অর্থ-সম্পর্কে নামিয়ে এনেছে।[৮]

মার্ক্সীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী, বুর্জোয়া মানুষেরা নিজেদের এই স্বার্থসর্বস্ব, শোষণকামী চরিত্রকে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর অখণ্ড আধিপত্য ভোগ দখল করেই বজায় রেখে থাকে। আসলে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর মালিকানা ভোগ-দখল না করলে শ্রমিককে উৎপাদন-কাজে বাড়তি শ্রম করতে বাধ্য করা যাবে না, ফলে বাড়্তি উৎপাদন হবে না, বাড়্তি মুনাফাও আসবে না তাদের হাতে। তাইতো তারা সর্বাগ্রেই উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রকে কুক্ষীগত করে থাকে। এবং এই ব্যবস্থাকে নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখাটাই বুর্জোয়া মানুষদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এইভাবে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা তাদের নিজেদের হাতে চলে আসে ; তখন তারা সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে আগা-গোড়া ঢেলে সাজিয়ে নেয়। আর তা করতে গিয়েই তারা উৎপাদন কাজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী সাধারণ শ্রমজীবী মানুষজনের সাথে তাদের নিজেদের সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলে। এর পরিণামে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অর্থাৎ বুর্জোয়া সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রাম ত্বরান্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ বুর্জোয়া মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

> বুর্জোয়া শ্রেণী জন সংখ্যা, উৎপাদনের উপাদান ও সম্পত্তির ছড়ানো-ছিটানো বিক্ষিপ্ত অবস্থার ক্রমশঃ অবসান ঘটিয়ে চলেছে। এই শ্রেণী জনসংখ্যাকে ঘনীভূত করেছে, উৎপাদনের উপাদানগুলিকে এক-কেন্দ্রীকৃত করেছে এবং গুটিকতক হাতে সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত করেছে।··· বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজের শাসনকালে পূর্ববর্তী (শাসক) শ্রেণীগুলি [৯] একত্রে যতটা উৎপাদিকা শক্তি গড়ে তুলেছিল তার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক ও অধিকতর বৃহৎ উৎপাদিকা শক্তি গড়ে তুলেছে।[১০]

বুর্জোয়াশ্রেণী এই যে ব্যাপকতর উৎপাদন ব্যবস্থা ও বৃহত্তর উৎপাদিকা

শক্তি গড়ে তুলেছে তার পিছনে একটাই নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে ; আর তা হল উৎপাদন-পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি ক'রে ব্যাপক মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জনের এই তৎপর মানসিকতার জন্যই এই শ্রেণী আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে ও উন্নতমাণের যন্ত্রপাতি-মেশিনপত্র ব্যবহার ক'রে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাতেই যেমন আধুনিকত্ব ও নতুনত্ব এনেছে, তেমনি অন্যদিকে উৎপাদন-কাজে এনেছে দ্রুতি ও গতি। ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির চরিত্রও অভূতপূর্বভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মার্ক্স-এঙ্গেলসের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত :

> (আসলে) বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদনের হাতিয়ার, উৎপাদন সম্পর্ক ও তৎসহ সমাজের সমগ্র সম্পর্ককে ধারাবাহিকভাবে বিপ্লবমুখী চরিত্র দান না ক'রে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতেই পারেনা। (অথচ) বিপরীতপক্ষে উৎপাদনের পুরানো পদ্ধতিগুলিকে অপরিবর্তিত আকারে সংরক্ষণ করাটাই ছিল পূর্বেকার সমস্ত শিল্পীয় শ্রেণীগুলির অস্তিত্বের প্রথম শর্ত। উৎপাদনের ধারাবাহিক বিপ্লবমুখীকরণ, সমস্ত সামাজিক পরিস্থিতির অনাহত সঙ্কট (ত্রুটি-বিচ্যুতি), চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও বিক্ষোভ সমস্ত পূর্বেকার যুগের থেকে বুর্জোয়া যুগকে পৃথক করেছে।[১১]

মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' ('The Manifesto of the Communist Party') থেকে আমরা এই কারণেই বিবৃত করলাম যে বুর্জোয়া মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি মার্ক্সীয় ধারণায় কী হতে পারে তা যেন সহজেই অনুধাবন করা যায়। উক্ত উদ্ধৃতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া মানুষের যে বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে বুর্জোয়া মানুষ বলতে বোঝায় একজন শোষক মানুষকেই, যে মানুষ উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজের কুক্ষীগত করে রাখে, উৎপাদনের উৎপাদনগুলির

একচেটিয়া মালিকানা ভোগ করে, উৎপাদন কাজে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ-মজুরীর বিনিময়ে বাড়তি শ্রম করতে বাধ্য করে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনকে বিপ্লবমুখী ক'রে তোলে, মানুষের সাথে মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থ-চেতনার বন্ধন গড়ে তোলে, পারিবারিক সম্পর্ককে নিছক অর্থ-সম্পর্কে পরিণত করে, মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক আবেগানুভূতির সম্পর্ককে বিনষ্ট করে তাদের যন্ত্র-মানুষে পরিবর্তিত করে, তাদের শ্রমের মূল্যে অর্জিত মুনাফা আত্মসাৎ করে। এক কথায়, বুর্জোয়া মানুষেরা নিজেদের উত্তরোত্তর মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে শিল্পগত উৎপাদন-কেন্দ্রিক এক শ্রেণীবৈষম্যমূলক, শোষণমুখী, হৃদয়হীন সমাজ গড়ে তোলে, যা সন্দেহাতীতভাবে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

বুর্জোয়া মানুষ সম্পর্কিত এই (উদ্ধৃতি-ভিত্তিক) মার্ক্সীয় মাপকাঠিতেই এবার আমাদের বিচার করে দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সীয় অর্থে বুর্জোয়া ছিলেন কিনা এবং তাঁর পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য ঠাকুর পরিবারটি বুর্জোয়া পরিবার ছিল কিনা। তাহলেই আলোচ্য বিতর্কের সমাধান হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই।

ঠাকুর পরিবার

বলাই বাহুল্য, যে ঠাকুর পরিবারের সুযোগ্য বংশধর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেটি সেই সময় সুপরিচিত, বিত্তশালী ও প্রভাবসম্পন্ন হলেও সেটি বুর্জোয়া-মানসিকতাসম্পন্ন পরিবার ছিল কিনা তা অবশ্যই একটা বিচার্য বিষয়। ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সেই সময় এই পরিবারের তুলনা সত্যিই বিরল ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এই পরিবারটি যথেষ্টই খ্যাতি লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ (মেজদা) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সর্বপ্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। তাঁদের এই পরিবারটিই

ছিল তদানীন্তন বঙ্গসংস্কৃতির পীঠস্থান। সাহিত্যচর্চায় এই পরিবারটিই ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগণ্য। এই পরিবারের শুধু পুরুষ সদস্য-গণ নয়, মহিলা সদস্যগণের অনেকেই সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সংগীতের জগতে এই পরিবারের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। এর প্রায় সব সদস্য-সদস্যাই ছিলেন হয় সংগীত-পিপাসু, সংগীত-রসিক, সংগীত প্রাণ, না হয় সংগীতজ্ঞ। অভিনয়, শিল্পকলা, চিত্র-ভাস্কর্য ইত্যাদির দিক থেকে এই ঠাকুর পরিবারের সুনাম ছিল সুপ্রসারিত। সব মিলিয়ে এই পরিবারটি সেই সময় খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল।[১২]

সুতরাং ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ এই ঠাকুর পরিবারটি সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ললিতকলা ইত্যাদি দিক থেকেও যথেষ্ট পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল। তবু কিন্তু এই পরিবারটি শ্রমবিমুখ, পরান্নজীবী, শোষণকামী বুর্জোয়া মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেনি অথবা বুর্জোয়াসুলভ জীবনধারায় গা ভাসিয়ে দেয়নি। আর এই কারণেই পরিবারটি সেই সময় আশাতীত সুনাম ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। এ দিক থেকে ঠাকুর পরিবারটিকে বিলাসী, অকর্মণ্য, শোষণকারী বুর্জোয়া পারিবারের পরিবর্তে একটি কৃষ্টিবান, রুচিশীল এলিট পরিবার (Elite family) বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে; কারণ ধন-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর মানুষের সমষ্টিকেই এলিট (Elite) বলা হয়ে থাকে।[১৩] তাই এই পরিবারটিকে স্বার্থসর্বস্ব শোষণমুখী বুর্জোয়া পরিবার বলে চিহ্নিত না করে সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে থাকা একটি প্রগতিশীল উৎকৃষ্ট পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করাটাই শ্রেয়।

তবে সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার স্বার্থে ঠাকুর পরিবারটি সংকীর্ণ-মনা, স্বার্থান্ধ, পরশ্রমজীবী, শোষণকামী বুর্জোয়া পরিবার ছিল কি ছিল না—তা যথাযথভাবে জানতে হলে এই পরিবারের ইতিবৃত্ত

আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচনা করা দরকার। এবং তার পরেই আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-জীবনে বুর্জোয়া মানুষ ছিলেন কিনা, এবং কবি হিসাবেও তিনি বুর্জোয়া মানসিকতা-সম্পন্ন ছিলেন কিনা।

রবীন্দ্রনাথের বহুখ্যাত 'জীবনী' গ্রন্থে[১৪] ঠাকুর পরিবারের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখান থেকে সামান্য কিছু অংশের মধ্য দিয়ে আমরা এই পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে এর চরিত্রের গতি-প্রকৃতি জানতে চেষ্টা করব।

এদেশে, কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এদেশে ইংরেজ-রাজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মোটামুটিভাবে এই পরিবারটি কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করে। কলকাতায় আসার আগে পারিবারিক 'কুশারী' পদবী অনুসারেই এই পরিবারটি কুশারী পরিবার নামেই চিহ্নিত ছিল। সেদিনে কিন্তু সংস্কারমুক্ত, প্রগতিবাদী, ধর্মান্ধতা-বিমুখ, প্রথা সর্বস্বতা-মুক্ত এই পরিবারটিকে তদানীন্তন সংস্কারাচ্ছন্ন, আচার-প্রধান, প্রথা-সর্বস্ব, গোঁড়া হিন্দু সমাজের চরম বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই পরিবারের পরিজনদের নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (বা পতিত ব্রাহ্মণ) বলেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। ফলে তাঁদের প্রায় 'একঘরে' হয়েই থাকতে হত। তবে তাঁরা এই সামাজিক প্রতিকূলতার মুখে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে দিব্যি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতায় এসে তাঁরা পার্সী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত ক'রে বৈদেশিক ব্যবসায়, বিশেষ করে ইংরেজদের সাথে ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা উভয়ই অর্জন করেছিলেন। এবং এর ফলেই তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতির কুণ্ঠিত অতীত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয় এবং তাঁদের পূর্বেকার

কুশারী পদবীও ধীরে ধীরে অপ্রচলিত ও বিস্মৃত হয়ে পড়ে। এবং সেই সময় তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সাহিত্য-ললিতকলা, ধন-সম্পদে সমাজের উচ্চস্থানে আসন পেয়েছিলেন বলে তাঁরা এবার ক্রমশঃ 'ঠাকুর' এই সম্মানীয় পদবীতে ভূষিত হতে থাকেন। ইংরেজ-দের মুখে ঠাকুর হয়ে দাঁড়ায় টেগোর বা Tagore। তার থেকেই ঠাকুর পরিবার।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

আগেই বলেছি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬)। তিনি বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত ক'রে স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা সহ সংস্কৃত, ইংরেজী, পার্সী ও আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, আইন বিষয়ে তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও জ্ঞান ছিল। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীতে তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরক্ত। "তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনের পথও প্রশস্ত করিয়াছিলেন" (শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[১৫] এসবের ফলে দেশে ও বিদেশে তাঁর ব্যবসায় যথেষ্ট জম-জমাট হয়ে উঠেছিল। ব্যবসায় থেকে তাঁর প্রচুর অর্থাগমও ঘটেছিল।[১৬] পরবর্তীকালে জমিদারী করেও তিনি যথেষ্ট ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৮৪২ সালে তিনি প্রথম বিলাতে যান এবং সেখানে পূর্ণোদ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা শুরু করেন।[১৭] এবং ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে ব্যাপক অর্থাগমের সাথে সাথে তিনি সেখানে জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় জীবনযাপন শুরু করেন। এই সময়েই তিনি তাই সেখানকার সম্ভ্রান্ত সমাজে 'প্রিন্স' (Prince) উপাধিতে ভূষিত হন।[১৮] এ প্রসঙ্গে মনে রাখা একান্ত দরকার যে ব্যয়-বহুল জীবন-যাপন করলেও

দ্বারকানাথ ঠাকুর মশাই কিন্তু কোন অর্থেই আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব, শোষক মানুষ ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কাজে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কল্যানার্থে ও সাধারণ মানুষের উন্নতির প্রয়োজনে অকাতরে অর্থ দান করেছিলেন।[১৯] এ সমস্ত কারণে তাঁকে প্রচুর ঋণ করতেও হয়েছিল, যার বোঝা তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে বর্তিয়েছিল।[২০]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য থেকে এটাই প্রতিপন্ন হতে পারে যে ধনীসুলভ ব্যয়বহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হলেও তিনি সমাজ ও জনসাধারণের স্বার্থকে উপেক্ষা করেননি; অথবা প্রজা-সাধারণের উপর তিনি শোষণের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছেন—এমন ঘটনাও পাওয়া যায় না।[২১] বরং প্রজাদের উৎসব-অনুষ্ঠানে তিনি যথেষ্ট দান-ধ্যানাদিও করেছেন। তাছাড়া প্রজাদের অনুষ্ঠানাদিতে স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তিনি বজায় রেখেছিলেন। তদুপরি সাধারণ জনগণের স্বার্থ, ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনি বিলাতের সমাজেও তুলে ধরেছিলেন। বিলাতের সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের জনগণের শোষণ-বঞ্চনার করুণ কাহিনী তিনি ইংরেজদের সামনে তুলে ধরতেন ও প্রতিকারের আকুল আবেদন জানাতেন। অন্ততঃ এই দিক থেকে তাঁকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি বলা যেতেই পারে। তাই তাঁকে বুর্জোয়া মানুষ, স্বার্থান্ধ, পরশ্রম-জীবী, শোষক মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করার প্রশ্নই ওঠে না, যদিও তিনি নিঃসন্দেহে ধনী ব্যক্তিই ছিলেন। রমাকান্ত চক্রবর্তী (Ramakanta Chakrabarty) Society and Change নামক পত্রিকার এক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বলেছেন যে,

> "প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (লণ্ডনের) গোল টেবিল বৈঠকে ছিলেন এক 'সাধারণ অধীনস্থ মানুষ' ('Subaltern')। হাজতবাস কালে জওহরলাল

নেহেরুও ছিলেন একজন 'সাধারণ অধীনস্থ মানুষ'। এইসব গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আপাতঃ উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণের স্বার্থকেই তুলে ধরা" (অনূদিত)

"Prince Dwarakanath Tagore was a 'subaltern' in the Round Table Conference. Jawaharlal Nehru was a 'subaltern' in Jail. The apparent intention of the big men was to champion popular causes" (মূল বক্তব্য)।[২২]

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫)। তাঁর অধীনেই ঠাকুর পরিবারটি প্রকৃতপক্ষে যশ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। পিতার ব্যয়বহুল জীবন-যাপন ও ব্যাপক দানমূলক কার্যাদির জন্য যে প্রভূত ঋণ হয়েছিল তা তিনি আদর্শ পুত্রের মতো মাথা পেতে বহন করেন। "পিতার এই নিদারুণ ঋণ আর বহুবিস্তৃত বিষয়-সম্পত্তি দুয়েরই ভার তিনি পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন তাঁর জীবন-বিধাতার দান হিসাবে, আর দীর্ঘকাল ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টায় সেই ঋণ পরিশোধ ক'রে পারিবারিক গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন—শুধু পুনঃ প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে এক নতুন মহিমায় মণ্ডিত করলেন, কেননা, তাঁর কালেই তাদের পরিবার অর্জন করল বাংলার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠা।" (আবদুল ওদুদ)।[২৩]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় সারা জীবন ধন-ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও ঋষিতুল্য জীবন-যাপন করতেন, (এখানেই পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর পার্থক্য)। তাঁর অধ্যাত্ম

পরায়ণ, নির্লিপ্ত জীবন-ধারা, তাঁর ধর্মবোধ ও চরিত্র-মাহাত্ম্য তাঁকে জনসাধারণের কাছে মহর্ষি নামে পরিচিত করিয়েছিল,[২৪] তাঁর আদর্শ-পরায়ণ, পরার্থপর, দানমুখী, ত্যাগী ও সংযমী জীবন-যাত্রা তাঁকে জগত-সমক্ষে অনুকরণীয় সাধারণত্ব ও মানবিকতার মহত্ত্বে উদ্ভাসিত করেছিল, যার জন্য কখনও তাঁর চরিত্রে বিলাসী, পরশ্রমজীবী, স্বার্থপর, শোষণকারী বুর্জোয়া মানুষের গ্লানি ও কালিমা লেপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পিতার বিপুল ঋণের বোঝা পরিশোধের জন্য তিনি যে কঠোর সংযম, অস্বাভাবিক ত্যাগ ও দুর্দম সত্যনিষ্ঠার পথ অনুসরণ করেছিলেন সে সম্পর্কে অসিতকুমার হালদার লিখেছেন,

> (পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য) "তাঁদের ব্যয় সঙ্কোচন দ্বারা কিভাবে দৈনিক প্রত্যেককে চার আনা মূল্যের মাত্র খাদ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং স্নানের ব্যবহারের জন্য সাবান পর্যন্ত পাননি। আর চাকর-দাসী ছাড়িয়ে নিজেদের সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়েছিল তার সব কথা দিদিমা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজ কন্যা ও কবির মেজদিদি) আমাদের বলতেন। মহর্ষি (দেবেন্দ্রনাথ) শুধু তাঁর তরফের কৌঁসুলীর পরামর্শ মত "ঋণ বিষয়ে কিছু জানি না" বললে (অর্থাৎ পিতৃঋণ অস্বীকার করলে) হাইকোর্ট থেকে নিষ্কৃতি পতেন এবং বিষয়-আসয় বজায় থাকতো সরকারের নিয়োজিত Trusteeদের হাতে। কিন্তু তিনি সত্যভ্রষ্ট হন নি। এই ব্যাপার শুনে [তখন-কার লোকেদের মুখে শুনেছি] তাঁর প্রতি সহানুভূতি-নিষ্যন্দিত অশ্রুবর্ষণ হয়েছিল বিচারালয়ে এবং বাহিরের জনতার মধ্যে। দেবেন্দ্রনাথের মহর্ষি নাম সেই থেকে মুখে মুখে প্রচারিত হল এবং

জগত সমাজে বিদিত রইল।" (অসিতকুমার হালদার)[২৫]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশাই যে প্রকৃতই 'মহর্ষি' ছিলেন তা তাঁর জীবনালেখ্য বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাঁর সাধুতা, সততা ছিল দৃঢ়মূল; তাঁর নির্লোভ মানসিকতা ছিল সুদৃঢ় ও অটুট। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও নীচতার প্রতি ছিল তাঁর চরম বিতৃষ্ণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার এই সদাশয়তা, প্রতারণা-বিমুখতা ও নির্লোভ মানসিকতার ছবি অন্তর দিয়ে এঁকেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে। মহর্ষি সেবার কবিকে নিয়ে হিমালয় ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। বোলপুর থেকে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর হয়ে এবার,

> কোন একটা বড় স্টেশনে (অমৃতসরে) গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল; উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উস্‌খুস্‌ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধহয় স্বয়ং স্টেশন-মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্‌ টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটির বয়স বারো বছরের অধিক নহে?" "পিতা কহিলেন 'না'। তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি কিছু বেশী হইয়াছিল। স্টেশন-মাষ্টার কহিল, "ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।" আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা

> বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেঝের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশন মাষ্টার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া গেল—টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেট করিয়া দিল।[২৬]

মহর্ষির এই সততা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্লোভ মানসিকতা তাঁর কঠোর সংযমী ও ঋষি-সুলভ জীবনযাত্রার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছিল। তিনি স্বেচ্ছাচারিতা, শোষণমুখীনতা ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে কবির দৃঢ় মানসিকতা গড়ে তোলার দিকেও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। তিনি তাঁকে (কবিকে) জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা, সংযম ও সততার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সাথে হিমালয় ভ্রমণকালের যে ছবি কবি এঁকেছেন তার মধ্যেই এই বিষয়ের স্বচ্ছ বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময় মহর্ষি প্রতিদিন আঁধার জড়ানো ভোরবেলায় কবিকে ঘুম থেকে ডেকে দিতেন। কবি উঠে সংস্কৃত পাঠাভ্যাস করতেন। ইতঃমধ্যে মহর্ষির উপাসনা শেষ হত; এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আর একবার উপাসনায় বসতেন। তারপর তাঁরা বেড়াতে বের হতেন। বেড়িয়ে এসে কবিকে একঘণ্টা ইংরেজী পড়তে হত। তারপর ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হত প্রতিদিন। এই রকম রুটিন-মাফিক জীবন যাত্রায় কবিকে তিনি অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন; লক্ষ্য ছিল জীবনকে সংযত করে রাখা, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে আদৌ প্রশ্রয় না দেওয়া, কারণ এদের পথ ধরেই জীবনে অহমিকা, লোভ, বিদ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা ও প্রবঞ্চনার প্রবণতা প্রবেশ করে। তাইতো তিনি জীবনকে সংযত ও সুস্থিত রাখার জন্য নিজে যেমন উপাসনা ও ধ্যানাদি করতেন তেমনি কবিকে এ ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। কবি

তাঁর পিতার আঁধার-জড়ানো প্রত্যূষকালীন সাধু-সন্ত-সুলভ উপাসনার এক নিবিড় বর্ণনা দিয়েছেন,

> এক একদিন, জানি না কত রাতে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ-সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাঁচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেছেন।[২৮]

মহর্ষির এই অধ্যাত্ম-চেতনাই তাঁকে ঋষি-সুলভ মহৎ মানুষে পরিণত করেছিল। আর তাঁর এই ঋষি-তুল্য জীবনই তাঁকে কখনও শোষণকামী, পরশ্রমজীবী, বিলাসী বুর্জোয়া মানুষের জীবন-ধারায় পরিচালিত করেনি, এবং তাঁকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেরাচারিতার পথে এগিয়ে দেয়নি। তিনি অর্থ উপার্জন করেছিলেন ঠিক কথা, তবে তা করেছিলেন সৎপথে, নিজের নিষ্ঠা আর কর্ম-মুখীনতা দিয়ে, কখনও বিপথগামিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নয়, কাউকে শোষিত-বঞ্চিত করে নয়। অর্থ তাঁর জীবনে কখনও কোনো অনর্থ সৃষ্টি করেনি, তাঁকে অর্থগৃধ্নু, মুনাফালোভী শোষকে রূপান্তরিত করেনি। অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তিনি কখনও কর্মবিমুখ, বিলাসী, পরান্নজীবী হয়ে ওঠেন নি, বরং অর্থ ও ঐশ্বর্যের মধ্যেও তিনি জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। দান-ধ্যানেই যে জীবনের প্রকৃত মুক্তি, শোষণ বা নিপীড়নে নয়—তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বৈষয়িক কাজ-কর্মের মাঝে যখন যেটুকু সময় পেতেন তখন ততটুকু সময়েই তিনি ধ্যান বা ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে, মহর্ষির সমগ্র জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে রয়েছে তাঁর স্বার্থশূন্য সত্যান্বেষী ধ্যানমগ্নতার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কিছুটা রূপরেখা আমরা নীচের উদ্ধৃতির মধ্যে থেকে পেতে পারি,

> দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবনের প্রথম ধাপে তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের উদ্বোধন ও তীব্র আকুলতা ও বেদনা।

তখন তাঁহার যৌবন বয়স। বাহিরে তাঁহার দৃষ্টির উপর হইতে আবরণ উন্মোচিত হইয়া অনন্ত আকাশের মহিমা প্রসারিত হইল; অন্তরে তাঁহার মুগ্ধ সংস্কার ঘুচিয়া নানা তত্ত্ব সকল স্ফুরিত হইল। দ্বিতীয় ধাপে, তাঁহার আত্মশোধন।—বিষয়বৈরাগ্য এবং আপনাকে অশ্রান্তভাবে ধর্ম্মপ্রচারের কাজে নিয়োগ; ক্রমশঃ বাহিরের দিকেও তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি গেল, আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এমনি করিয়া একটা রিক্ততার সাধনা চলিতে লাগিল। তৃতীয় ধাপে, তাঁহার সমস্ত চৈতন্য পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে এবং সান্নিধ্যবোধে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তখন তাঁহার জ্ঞান প্রসন্ন হইল, হৃদয় নির্ম্মল হইল, এবং মন তাঁহাতে ধ্যায়মান হইল। তখনই তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ মন্ত্র ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মগ্রন্থের গভীরে মন্ত্রগুলিকে দর্শন করিলেন। তখন হইতেই তিনি ঈশ্বরের "আদেশবাণী" শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেরণা লাভ করিতে লাগিলেন। চতুর্থ ধাপে, কর্মজালে তিনি যেমন নিবিড়ভাবে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহার বন্ধনগুলি আল্‌গা হইয়া আসিল এবং সমস্ত ছাড়িয়া দূরে নির্জ্জনতার মধ্যে ধ্যানের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল।[২৭]

বস্তুতঃপক্ষে, আজীবন-তপস্বী মহর্ষিদেবের জীবনের বিশিষ্টতাই ছিল এই ধ্যান-আকুলতা ও ঈশ্বরপরায়ণতা। ভোগবিলাস, বিষয়-সম্পত্তি কোন কিছুর মোহই তাঁকে তাঁর অধ্যাত্মমুখীনতার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বরং প্রাচুর্য ও আভিজাত্যের মহিমার মধ্যেও তাঁর ধ্যান-নিবিষ্টতা ছিল অটুট। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> আমি কখন কখন কোন নির্জ্জন পর্বতের পার্শ্বস্থ শিলাতলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া এক বেলা কাটাইতাম। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি যে, একটা বনাকীর্ণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটা পথ চলিয়া গিয়াছে। আমি অমনি মনের সাধে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। আমি তন্মনস্ক হইয়া সেই যে চলিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার আর বিরাম নাই। পদ-ক্ষেপের উপর পদক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহা জানিনা। আমি কোথায় যাইতেছি, কতদুর এলাম, কতদুর যাইব, তাহার গণনা নাই। অনেকক্ষণ পরে একটি পথিককে দেখিলাম, সে আমার বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। ইহাতে আমার ধ্যান ভাঙিয়া গেল, আমাতে সংজ্ঞা আইল। আমি দেখি যে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি, বন, কানন সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল...ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম,—আমার উপরে তাঁহার অনিমেষদৃষ্টি রহিয়াছে।...তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তখনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই।[৩০]

এই আত্মসমর্পিত ঈশ্বরচিন্তা ও সত্যান্বেষী ধ্যান-নিমগ্নতার মধ্যেই মহর্ষিদেব জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন, বিপদে ভরসা পেয়েছেন,

ন্যায়-জীবনাচরণের পথ খুঁজে পেয়েছেন। ধ্যান-মগ্নতার এই অভাবনীয় প্রাপ্তি সম্পর্কে জনৈক লেখক যা লিখেছেন তা মহর্ষিদেবের অধ্যাত্ম-জীবনের প্রাপ্তির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন,

> গায়কের কাছে যেমন সুরসঙ্গতি (harmony), শিল্পীর কাছে যেমন রেখা ও বর্ণ, কবির কাছে যেমন ছন্দ; তেমনি সাধকের কাছে এই ধ্যান একটা উপকরণ—যাহার ভিতর দিয়া তিনি সহজেই সেই শিবসুন্দরকে দেখিতে পান ও তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারেন।[৩১]

এমন কি ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও (Wordsworth) ধ্যানমগ্নতার এই মহৎ-প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন—

> We are laid asleep
> In body, and become a living soul,
> While with an eye made quiet by the power
> of harmony, and the deep power of joy,
> We see into the life of things.

অর্থাৎ,

> (ধ্যানে) আমরা সুপ্ত হই দেহে, এবং আত্মা হয় জীবন্ত; সঙ্গতি ও আনন্দের নিগূঢ় ক্ষমতায় চক্ষু হয় প্রশান্ত। আমাদের দৃষ্টি তখন সমস্ত কিছুর জীবনে হয় প্রবিষ্ট।[৩২]

ধ্যানমগ্নতার এই প্রাপ্তি যেন জীবন দর্শন. যেন ঈশ্বর প্রাপ্তি। মহর্ষিদেবের জীবনেও এই প্রাপ্তিযোগ ঘটেছিল ধ্যান-মার্গের মধ্য দিয়ে। তিনি নিজেই বলেছেন,

> পুরুষানুক্রমে আমরা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়।··· গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিনে দিনে আরো

> প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে ; তিনি অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত এক ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই পূর্ব্বে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম ; এখন সেই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন।···তিনি আমার হাত ধরিয়া আনিয়াছেন। এক্ষণে আমি জানিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলাম।[৩৩]

বলাই বাহুল্য, ঈশ্বর-চিন্তায় এমন একান্তভাবে নিয়োজিত প্রাণ মানুষের মানসিকতায় উচ্ছৃঙ্খলতা, শঠতা ও শোষণ-বঞ্চনার স্পৃহা কখনও মুদ্রিত হতে পারে না।[৩৪] আর মহর্ষিদেব যে ঈশ্বর-চিন্তায় নিবেদিত-প্রাণ, ধ্যান-গম্ভীর, ভাব-সৌম্য মানুষ ছিলেন এবং তিনি যে আদৌ বকধার্মিক ছিলেন না অথবা অধ্যাত্মমুখীনতার আড়ালে বিষয়-সর্বস্ব সংকীর্ণ-মনা ছিলেন না তা কবি রবীন্দ্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে—

> যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে ; গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—
>
> তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
> কে সহায় ভব-অন্ধকারে।

> তিনি (মহর্ষিদেব) নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন।[৩৫]

মহর্ষিদেবের এই ঈশ্বর-চিন্তা ও ধ্যান-নিমগ্নতা সম্পর্কে অসিত কুমার হালদার 'সাবেকী কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> মহর্ষি সর্বদাই বারবাড়ীর তেতলায় থাকতেন এবং এক মুহূর্ত কালও মৌন অবস্থায় ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়েননি, কেবল কখনো প্রয়োজন হলে শুনেছি তিনি রত্নগর্ভা সৌভাগ্যবতী পত্নীর নিকট অন্দর মহলে যেতেন।... রবিদাদাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মত উদার পিতা পেয়েছিলেন।[৩৬]

এমনকি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও মহর্ষিদেবের এই অধ্যাত্ম-পরায়ণ জীবন সম্পর্কে লিখেছেন,

> বাড়ির কর্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্ম হবার পর এ বাড়ি থেকে পূজোপার্বনের পাট উঠে গেছে।...দেবেন্দ্রনাথ সংসারে থাকলেও আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিভোর।...শুধু আদর্শ দিয়ে (বাড়ির) সবাইকে তিনি নিয়মে সংযমে বেঁধেছেন।[৩৭]

মহর্ষিদেবের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধ্যান-নিমগ্নতার গভীরতার উদাহরণ পাওয়া যায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণে। তিনি লিখেছেন,

> আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একবার মহর্ষির সহিত নৌকাযোগে পদ্মানদীতে যাইতেছিলেন। একদিন দেখিলেন, মহর্ষি প্রাতে প্রাতরাশের পর নৌকা হইতে বাহির হইয়া নৌকার ছাদে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া নদী দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতে লাগিল, দিবা দ্বিপ্রহরে এক ভৃত্যের পর অপর ভৃত্য আসিয়া মস্তকে ছাতা

> ধরিতে লাগিল, মহর্ষির সে জ্ঞান নাই; আহারাদি পড়িয়া রহিল; ভিতরে আসিলেন না; চক্ষু মেলিলেন না; অবশেষে অপরাহ্নে চক্ষু খুলিলেন, তখন মনে হইল যে, নৌকার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।[৩৮]

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষিদেবের নিবিষ্ট চিত্তের ধ্যান-আকুলতার সম্পর্কে আরো লিখেছেন,

> একবার স্থির হইল যে, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে সায়ংকালের উপাসনা মহর্ষি করিবেন। আমরা তৎপূর্ব্ব দিন কোন্নগরে গেলাম।···মহর্ষি রবিবার সন্ধ্যার সময় কোন্নগরে উপাসনা করিবার উদ্দেশ্যে শনিবার প্রাতে আহারান্তে নৌকাতে উঠিয়াছিলেন; ···কিয়দ্দূর আসিয়াই হুকুম হইল, নৌকা নঙ্গর কর. তারপর মহর্ষি ধ্যানস্থ। সঙ্গীদ্বয় না পারেন কথা কহিতে, না পারেন নড়িতে চড়িতে। কয়েক ঘণ্টা পরে হুকুম হইল নঙ্গর তোল, আবার কথাবার্ত্তা চলিল; আবার কিয়দ্দূর আসিয়া হুকুম হইল নঙ্গর কর; আবার ধ্যানস্থ হইলেন। শনিবার সমস্ত নদী-পার্শ্বে নঙ্গর করিয়া কাটিয়া গেল। রবিবার ঐ প্রকার গতিতে আসা হইল।···নৌকাযাত্রার এই বিবরণ শুনিয়া আমরা সকলে···মহর্ষির ধ্যানপরায়ণতার বিষয় স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।[৩৯]

প্রকৃতপক্ষে,"··· মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ধ্যানযোগ সাধনার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। আভিজাত্য মর্যাদায় এবং ধন সম্পদে গৌরবান্বিত বংশে ভোগবিলাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং গৃহী হইয়াও এই মহাপুরুষ সাধন বলে একজন নির্লিপ্ত, নির্বিকার মহাধ্যান তাপস হইয়াছিলেন।"[৪০] মহর্ষিদেবের এই সাধু-জনোচিত জীবন-ধারা তাঁর চরিত্রে এক অনুপম বিশিষ্টতা ও মানবিক মাধুর্য এনে দিয়েছিল।

এই জন্যই তিনি কখনও আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব ও বিষয়মুখী হয়ে উঠতে পারেননি। বরং পরার্থপরতার আদর্শে তিনি সারা জীবন উদ্বুদ্ধ ছিলেন। যা কিছু নীচ, যা কিছু হীন তার প্রতি তাঁর ছিল আকণ্ঠ বিতৃষ্ণা। দুর্বলের প্রতি সবলের বলপ্রয়োগ, মানুষের উপর মানুষের শোষণপীড়ন এবং মানুষকে নিয়ে শঠতা ও প্রবঞ্চনার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি, কারণ স্বার্থপরতা ও শোষণ-বঞ্চনার মানসিকতায় মানবিকতার চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটে বলেই তাঁর একান্ত বিশ্বাস। তাছাড়া ধর্মকে নিয়ে ভণ্ডামি, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও ধর্মান্ধতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। পৌত্তলিকতার নামে ধর্মোন্মাদনার প্রতি তাঁর ছিল চরম অনীহা। তিনি নিজে যেমন পরমাত্মার চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি অন্যের বিশ্বাসকেও তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন। সত্যিই তিনি উদার মনের বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাইতো মুক্ত, উদার ও সরল মন নিয়ে পরমাত্মার সেবা করার জন্য তিনি বোলপুরের শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করলেন এক মহা মন্দির—এক ধর্মক্ষেত্র—সাধন-ভজনের এক আদর্শ আগার।

দিনটি ছিল ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ।[৪০ক] প্রতিষ্ঠিত হল শান্তিনিকেতনের সাধন-মন্দির। সাথে সাথে উদ্বোধিত হল মহর্ষিদেবের আধ্যাত্মমুখী, ধ্যান-পরায়ণ জীবনের নতুন গতিপথ। এই মন্দিরটিকে তিনি পরমাত্মার সেবায় তাঁর একার আত্ম-নিবেদনের স্থান হিসাবে নয়, পৃথিবীর সাধু-সন্তদের জন্যও সাধনার এক পীঠস্থান হিসাবে তিনি এই মন্দিরটি গড়ে তুলেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রতি বছর এক মেলার (ধর্ম-মেলার) আয়োজন করেছিলেন, যেখানে অনুষ্ঠিত হত সর্বধর্মের সম্মিলন—এক মহাসমন্বয়। কত বড় উদার ও পরার্থপর হলে তবেই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যায় তা ভেবে দেখার মতো। এখানেই মহর্ষিদেবের চরিত্রের অ-বুর্জোয়া-সুলভ মহৎ মানুষের অসাধারণ বিশিষ্টতা। এই শান্তিনিকেতন মন্দির সংক্রান্ত তাঁর 'ট্রাষ্ট ডীডে' (Trust deed) লিখিত বক্তব্য প'ড়ে

আমরা জানতে পারি যে শান্তিনিকেতনের মেলা উপলক্ষে এখানে অতিথিশালা ও উক্ত মেলায় আগত অতিথিদের পরিচর্যার ব্যবস্থাও তিনি করে গেছেন। ট্রাষ্ট ডীডে তিনি স্পষ্ট ক'রে লিখে গেছেন,

> ধর্মজ্ঞান উদ্দীপনের জন্য ট্রাষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল সম্প্রদায়ের সাতপুরুষেরা আসিয়া ধর্মপ্রচার ও ধর্মালাপন করিতে পারিবেন।……এই ট্রাষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর ক্রয় করিয়া দিবেন।[৪১]

মহর্ষিদেব যে কত বড় পরার্থপর মহত্ত্বের অধিকারী ছিলেন এবং কত ব্যাপক ছিল তাঁর মানবিকতাবোধ তা ট্রাষ্ট ডীডের এই অংশ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাঁর ট্রাষ্ট ডীডে সুস্থ মনুষ্যত্ব চেতনাকে উদ্দীপিত করার জন্য আরো লেখা আছে,

> এই মেলার উৎসবে কোনো প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে।[৪২]

ট্রাষ্ট ডীডের এই অংশ কুৎসিতের প্রতি মহর্ষির বিতৃষ্ণা এবং সততা ও উদার মানসিকতার প্রতি তাঁর একান্ত আন্তরিকতার নিদর্শন, সন্দেহ নেই।

এ হেন প্রকৃত ঈশ্বর-প্রাণ, ধর্ম-প্রবণ, উদারমনা, সংযমী, পরার্থপর, মানবিকতা-সম্পন্ন মানুষ মহর্ষিদেব যে কখনও বকধার্মিক, ভণ্ডতপস্বী হতে পারেন না তা বলাই বাহুল্য, শোষণকারী, প্রবঞ্চক, পরশ্রমজীবী, অলস বুর্জোয়া মানুষ হওয়া তো দূরের কথা। অন্যায়ের প্রতি, শঠতার প্রতি তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত, নইলে কি টিকেট

পরীক্ষকের মুখের উপর ষ্টেশনের মেঝেতে অতগুলি টাকা (মুদ্রা) ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন, না কোন বুর্জোয়া মানুষ আজকের দিনে পারে? কুসংস্কার আর অন্ধ গোঁড়ামির প্রতি তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা; তাইতো পৌত্তলিকতা নিয়ে নিছক ধর্মোন্মাদনা ও মেলার নামে মদ-মাংসের অসুস্থ উত্তেজনার সাথে শারীরিক বেলেল্লা-পনাকে তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। সব চেয়ে বড় কথা, সাধারণ মানুষ-জনের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা; সেই জন্যই তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'শান্তিনিকেতন' (Abode of Peace), প্রচলন করেছিলেন সেখানে সকলের যোগাযোগের জন্য এক সাম্বৎসরিক মহামিলন-মেলা, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তি-নিকেতনের সকল প্রকার অতিথিদের জন্য অতিথিশালা। মানুষের প্রতি নিবিড় আস্থা আর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ থাকলেপরেই এমনটি করা সম্ভব। স্বার্থপর, লোভী, মানুষ ঠকানো ধনীর পক্ষে এমনটি করা যে আদৌ সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। এদিক থেকে বিচার করলে মহর্ষিদেব কোন অর্থেই স্বার্থান্ধ, পরশ্রমজীবী, অর্থগৃধ্নু, শোষক বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত হতে পারেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠতম পুত্র হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ।[৪৩] আর এই রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি ছিলেন কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়টিকে আমরা দুটি দিক থেকে আলোচনা করব, যথা :—

(১) ব্যক্তি মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া ছিলেন কিনা এবং

(২) কবি (সাহিত্যিক) হিসাবে তিনি বুর্জোয়া ছিলেন কিনা।

প্রথমে আমরা 'ব্যক্তি-জীবনে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া-মানুষ কিনা'—এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে আলোচনা করব তিনি 'বুর্জোয়া-কবি' কিনা—এই বিষয় নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ কি ব্যক্তি-জীবনে বুর্জোয়া মানুষ ?

প্রবন্ধের সূচনার দিকেই বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এক ধনী পরিবারে। তাঁদের ঠাকুর পরিবারটি শুধু ধন-সম্পদেই পরিপূর্ণ ছিল না, ছিল শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতিতেও। শুধু তাই নয় এই পরিবারটি আদব-কায়দা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি দিক থেকে ছিল বিশেষভাবে অগ্রবর্তী। বিদেশ-বিশ্বেও এর পরিচিতি ছিল বিশেষ করে শিক্ষা, সাহিত্য আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ ধরেই। সমাজ-জীবনের সব দিক থেকে এগিয়ে থাকা এই উৎকৃষ্ট (এলিট) পরিবারেরই সন্তান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে তাঁকে জীবনে দুঃখ-কষ্টের বা অর্থসংকটের মুখে স্বাভাবিকভাবেই পড়তে হয় নি। বরং নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জীবন-যাত্রাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

একথা ঠিক যে ধনী পরিবারের সন্তান হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করার সুযোগ পেয়েছিলেন; কিন্তু তাই বলে কখনও ধন-সম্পদের সীমাহীন গভীরতায় তিনি ডুবে থাকেন নি, ঐশ্বর্যের যথেচ্ছ ব্যবহারের দ্বারা জীবনকে কখনও বিলাসী, কর্মবিমুখ ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলেননি এবং পর্যাপ্ত ভোগ-সম্পদের মধ্যে থেকে আদুরে গোপালটি সেজেও বসে থাকেননি। অত্যন্ত সাধারণ, স্বাভাবিক জীবন তাঁকে যাপন করতে হত। বিলাস-ব্যসন তো দূরে থাক, জীবনের সাধারণ প্রয়োজনটুকুও সহজভাবে তাঁরা পেতেন না। ধনী গৃহে স্বাভাবিকভাবে যে ঐশ্বর্যের উচ্ছৃঙ্খলতা, আদর-আবদারের সীমাহীনতা এবং (ছেলেমানুষী) দাবী-দাওয়ার উদ্দামতা দেখা যায় তার কোনটিরও অস্তিত্ব তিনি ঠাকুর পরিবারে খুঁজে পাননি। তিনি তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

আমাদের শিশুকালে ভোগ বিলাসের আয়োজন ছিলনা বলিলেই হয়। মোটের উপর তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল।···আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।···

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎ-সামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোন কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।·· আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে।···

···কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা-কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম,

> তাহার ঘোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।[৪৪]

সুতরাং (রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই) দেখা যাচ্ছে যে ধনী-বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ ধনৈশ্বর্যকে নিয়ে এতটুকু হেলাফেলা করে কাটাবার অবকাশ পাননি। আসলে তাঁদের জীবনে ধন-সম্পদের গরিমা (কবির কথা অনুযায়ী) এতটুকু ছিল না; ইচ্ছামত অর্থব্যয়ের কোনও সামর্থ্য ছিল না, অর্থনৈতিক বিলাস বা আর্থিক স্বেচ্ছাচার তো সেক্ষেত্রে দূরের কথা। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, সংযত, সহজ, স্বাভাবিক ও নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেই বাধ্য থাকতে হত। আলালের ঘরে দুলালটি সেজে সোহাগ খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই (ঠাকুর পরিবারে) তাঁদের ছিল না। 'ভৃত্যরাজক তন্ত্রের' অধীনে নিঃসঙ্গ বন্দী জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল। পরিণত বয়সে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।
>
> আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।...গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য

গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে একটা প্রকাণ্ড চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডি বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। ⋯ ⋯

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশী যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের এই অংশ থেকে এটুকু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক যে শৈশবে তাঁকে ভৃত্য-মহলে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়েছে। ভৃত্যমহলে জীবন যাপন করতে গিয়েই তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ধনী বিত্তশালী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সাধারণভাবে যে আদর-আবদার আর বিলাসে জীবন কাটে সেই আদর-আবদার ও বিলাস-ব্যসন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছিলেন।

তবে তাঁদের ভৃত্যমহলে জীবন-যাপন করার এই ঘটনাটির জন্য

কেউ কেউ বলতে পারেন যে এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঠাকুর পরিবারের বুর্জোয়া-সুলভ চরিত্রটি। কারণ বিত্তশালী, ধনকুবের অভিজাত পরিবারের রেওয়াজই হল চাকর-বাকরদের হাতে ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনার ভার তুলে দিয়ে পিতা-মাতার অলস, বিলাসী, স্বচ্ছন্দ ও বৈষয়িক জীবনে গা ভাসিয়ে দেওয়া। পিতা যদি বুর্জোয়া-চরিত্রের মানুষ[৪৬] হন তাহলে তিনি বৈষয়িক চিন্তা বা লাভ-ক্ষতির হিসাবেই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন ; আর মাতা যদি অভিজাত বুর্জোয়া পরিবারের সদস্যা হন তাহলে তিনি স্বচ্ছন্দ ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনই অধিক-তর পছন্দ করেন। এমত অবস্থায় এই পিতা-মাতার সন্তান সন্ততিদের ভৃত্য বা পরিচারিকার (Governess) হাতেই মানুষ হতে হয়। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথকে ভৃত্যমহলে জীবন যাপন করতে হত বলেই ঠাকুর পরিবারের বুর্জোয়া চরিত্রের অভিযোগ কেউ কেউ করতে পারেন।

কিন্তু এই ধরণের কোন অভিযোগ ঠাকুর পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলেই মনে হয়। পিতা-মাতার অধীনে এবং তাদের স্নেহচ্ছায়ায় রবীন্দ্রনাথের বা তাঁর সহোদর ও সহোদরাদের বাল্য-জীবন কাটেনি—একথা ঠিক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁদের পিতা-মাতা (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবী) বুর্জোয়া-সুলভ অভিজাত, বিলাসী, বৈষয়িক জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ভৃত্যমহলে তাঁদের জীবন যাপনের পিছনে কারণ ছিল এই যে মহর্ষিদেব বৈষয়িক জীবনের চেয়ে ঋষিসুলভ অধ্যাত্ম চেতনার জীবনকেই অধিকতর পছন্দ করে নিয়েছিলেন ; সংসারী জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে ধীরে ধীরে কমে আসছিল। তাই সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মধ্যেই তীর্থযাত্রা, হিমালয় যাত্রায় বেড়িয়ে পড়তেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতালার ঘর বন্ধ থাকিত।"[৪৭]

মহর্ষিদেবের এই ভ্রমণ অবশ্যই প্রমোদভ্রমণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের 'হিমালয় যাত্রা' প্রবন্ধে পিতার সাথে হিমালয় ভ্রমণকালে তাঁর (পিতার) উপাসনাময় কঠোর সংযমী সন্ন্যাসী-সুলভ জীবনের এবং সেখানে গভীর রাত্রে তাঁর ধ্যানমগ্নতার নিবিড় চিত্র এঁকেছেন, যথা,

> আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় (হিমালয়ের) পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাত্তির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।[৪৮]

তিনি এ সম্পর্কে আরো লিখেছেন যে,

> পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে··· আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।[৪৯]

মহর্ষিদেবের এই অধ্যাত্ম-মুখী ভ্রমণ-পিপাসু মানসিকতার জন্যই তাঁর সন্তান-সন্ততিদের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচর্যার খুব একটা অবকাশ ছিল না।[৫০]

অনুরূপভাবে তাঁর স্ত্রী সারদা দেবীর (রবীন্দ্রনাথের মাতা) পক্ষেও সন্তান-সন্ততিদের নিজে হাতে লালন পালন করা সম্ভব ছিল না। কারণ ('জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের পরিশেষে উল্লিখিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী) ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যেকার ২৫ বছর ব্যবধানের মধ্যে ১৫টি সন্তান প্রসব[৫১] করার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অসুস্থা ও শারীরিক রুগ্না হয়ে পড়েছিলেন। এর ফলেই তিনি তাঁর

সন্তান-সন্ততিদের নিজের হাতে পরিচর্যা করার যোগ্য অবকাশ পাননি। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের লেখক আবদুল ওদুদ এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> মাতার সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন পাননি। তার কারণ, দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থা ছিলেন। তিনি যখন পরলোক-গমন করেন তখন কবির বয়স বছর চৌদ্দ।[৫২]

এর ফলেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহোদর-সহোদরাদের পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় ও প্রত্যক্ষ অধীনে বাল্য-জীবন যাপন করা সম্ভব হয়নি। তাই ভৃত্য মহলেই তাঁদের (শৈশব) জীবন কাটাতে হয়েছিল। এই ঘটনার মধ্যে ঠাকুর পরিবারের বুর্জোয়া-প্রবণতা অন্বেষণের চেষ্টা তাই না করাই ভালো বলে মনে হয়।

তাছাড়া ভৃত্যমহলে জীবন যাপন করতে গিয়ে আদর-আহ্লাদ দূরে থাক বিড়ম্বনাও তাঁদের কম সহ্য করতে হয়নি। ভৃত্যদের শাসন কখনো কখনো নিপীড়নে দাঁড়িয়ে যেত। ভৃত্যমহলে 'আদুরে গোপালটি' হয়ে বসে থাকার কোনও অবকাশ তাঁদের ছিল না : বায়নার পর বায়না তুলে যা-ইচ্ছে তাই পাওয়ার (বা করার) আবদার করবারও কোনও সুযোগ ছিলনা। ভৃত্যেরা এ ধরনের দাবী-দাওয়া বা আদর-আবদারকে আদৌ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলনা ; বরং তারা তাদের শাসন বেশ দৃঢ় হাতে পরিচালনা করতেই অভ্যস্ত ছিল। এই শাসনের প্রতি এতটুকু অনাস্থা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের কপালে প্রহারও জুটত—তিনি নিজেই একথা লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন,

> ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিলনা। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে

পাইনা। এই সকল রাজাদের পরিবর্তন বারম্বার ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল তাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ-সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই— পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম, সংসারের ধর্মই এই—বড়ো যে সে মারে, ছোট যে সে মার খায়।···

···মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত।··

এখন এক একবার ভাবি, ভৃত্য হাত হইতে কেন এমন নির্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে আকার-প্রকারে আমরা যে স্নেহ দয়া মায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারিনা। আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। ছোট ছেলেকে যদি ছোট ছেলে হইতে দেওয়া যায়—সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার

> নিজেই অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ানো হয়। যে-বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরীর লোভে কাঁধে করে বটে, কিন্তু ঘোড়া বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।
> এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিল চড় আকারেই মনে আছে—তাহার বেশি আর মনে পড়েনা। [৫৩]

বলাই বাহুল্য, ভৃত্যমহলের এ রকম কঠোর শাসনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর-কাল কেটেছিল। যৌবনে অবশ্য ভৃত্যদের মাত্রাতিরিক্ত শাসনের কঠোরতা হ্রাস পেয়েছিল। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনায় ভরপুর ঠাকুর পরিবারের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় রবীন্দ্রের মানসিকতার স্বাধীনতা কৈশোর-অন্তে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। এবং পূর্ণ যৌবনে স্বাধীনভাবে তিনি আত্ম প্রতিষ্ঠা করলেন এবার।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের উপর পৈত্রিক জমিদারি তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব এসে পড়ল; উত্তর-বাংলায় তাঁদের ঠাকুর পরিবারের যে বিশাল জমিদারি ছিল পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে সেই জমিদারির তত্ত্বাবধানের সমস্ত দায়িত্ব তাঁকে (কবিকে) নিতে হল।[৫৪] এবং এই উদ্দেশ্যে জমিদারিতে বড় বড় যে কুঠিবাড়ী ছিল সেখানে এসে তিনি বসতি স্থাপন করেন। এখানেই জমিদার

রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের এই জমিদারি প্রাপ্তির ঘটনার মধ্যে কেউ কেউ তাঁর বুর্জোয়া-সুলভ প্রবণতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন, কারণ সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় জমিদার মাত্রই (সীমিত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে) শোষক, প্রজাপীড়নকারী, পরান্নজীবী, স্বার্থসর্বস্ব, হৃদয়হীন; দুর্দিনেও প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না, বরং চরম সংকটের মুহূর্তেও তাদের কাছ থেকে সে কর বা খাজনা আদায় করে নেয়। নিরন্ন প্রজাকেও তাই ঘটি-বাটি বিক্রী করেও জমিদারের দেনা মেটাতে হয়। তার অপকর্মের বিরুদ্ধে দুঃস্থ-দরিদ্র অসহায় প্রজারা কোন প্রতিবাদই করতে পারে না, করলে তাদের কপালে জুটবে নির্মম অত্যাচার। বিদ্রোহী প্রজাদের জমিদারের সংরক্ষিত লেঠেল বাহিনী সহজেই পর্যুদস্ত ক'রে জমিদারের শাসন-শোষণই জোর করে বজায় রাখে। জমিদার সম্পর্কে এই ধরণের ধারণাই সমাজে বহুল প্রচলিত।

এই প্রচলিত ধারণার প্রেক্ষাপট থেকে কেউ কেউ 'রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন'—এই ঘটনা শুনেই এবং জমিদার থাকাকালীন তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে প্রায় কিছুটা অনবহিত থেকেই শোষক, প্রবঞ্চক, সুদ্‌খোর, বিলাসী, অকর্মন্য বুর্জোয়া জমিদার মানুষের সাথে জমিদার রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য থাকতে পারে বলেই মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন সাধারণ জমিদারের মতো ছিলেন না। অন্ততঃ তাঁর নিজের কথাতেই এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে! জমিদার ও নিজের জমিদারি সম্পর্কে তিনি অকপটে স্বীকার করে বলেছেন,

> আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক,

সে প্যারাসাইট্‌, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।[৫৫]

তথাকথিত জমিদারির প্রতি কবির অনীহা ও বিতৃষ্ণা যে কতটা গভীর তা তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে কারণ তিনি বুঝতেন জমিদার-মাত্রই পরশ্রমজীবী ও পরান্নভোগী। তবু তদ্‌সত্ত্বেও তাঁকে বেশ কিছুটা সময় পৈত্রিক জমিদারি চালাতে হয়েছে। এরকমভাবে জমিদারি বজায় রেখে জমিদার ও জমিদারির সমালোচনা করার মধ্যে কবির সৎসাহস থাকলেও কখনো কখনো মনে হতে পারে যে আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের অবস্থিতি (Position) সুরক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, নিদেনপক্ষে জনগণের সামনে জমিদার হিসাবে নিজের উদারতা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। কবি নিজেই যেন ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন! তাই আবার আত্মস্বীকার করে তিনি বলেছেন,

আমি নিজে জমিদার, এইজন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তাহলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানব স্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে-বুদ্ধি যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল

হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয় পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁত নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায় তাদের "নামে রুচি" আছে, কিন্তু কাল যখন "জীবে দয়া"র দিন আসবে তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তাহলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরা গাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটা গাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটি বদল হল না তো।

…আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি, রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের বলছে 'রাজা'; —মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়।…প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্ত-পিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে।

…আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর

গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙ্গল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত সীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না।[৫৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জমিদার ও জমিদারি সম্পর্কে কবি নিজে একজন জমিদার হয়েও চরম বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। জমিদারির অন্যায় ও অপশাসনকে তিনি কখনও মেনে নিতে পারেন নি। তাই সমকালীন জমিদারি ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন এবং তার প্রতিবিধানের চেষ্টাও করেছেন, নইলে কি তিনি আর বলতে পারতেন যে,

> ...উত্তরাধিকার সূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সত্ত্ব হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোট ছোট জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার তুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকেনা। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব সমাসে তা আর টেঁকে না, আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করিনি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেছি।

যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারেই অসম্ভব হয়েছে তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে।[৫৭]

কবির এইসব বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে জমিদারির ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার এই প্রয়াসের মধ্যে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত রয়েছে, এমন কি আত্ম-প্রচারের ব্যাপারটিও নিহিত রয়েছে। কিন্তু তবু এই বক্তব্যের মধ্যেই যে জমিদারির নীচতা সম্পর্কে কবির সীমাহীন ঘৃণা, ও আকণ্ঠ বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তিনি মনে করেন যে শুধুমাত্র আর্থিক সংগতির কারণেই জমিদারেরা সংগতিহীন প্রজাদের উপর শাসন শোষণ চালায়। নিঃস্ব-রিক্ত কৃষকদের জোর করে চাষ করতে বাধ্য করে এবং জমিকে মূলধন ক'রে মুনাফা লাভ করে। আগেই উল্লেখ করেছি যে তিনি স্বীকার করেছেন, "আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।"[৫৮] তাইতো স্বয়ং জমিদার হয়েও তিনি একথা কবুল করেছেন যে "জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, চাষীর।"[৫৯] কারণ, তাঁর বিশ্বাস হল এই যে

> …বই তারি হওয়া উচিত যে-মানুষ বই পড়ে। যে-মানুষ বই পড়েনা অথচ সাজিয়ে রেখে দেয় বইয়ের সদ্‌ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে।[৬০]

কবি তাই মনে করেন যে পরশ্রমজীবী জমিদারেরাও জমির মালিক সেজে অথচ ব্যক্তিগতভাবে সেই জমিতে শ্রম না ক'রে জমির অসদ্ব্যবহার করে থাকে। কবি বলেন, "এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব।"[৬১] প্রকৃতপক্ষে, তিনি জমিদারির শাসন-শোষণকে মনে-প্রাণে আদৌ স্বীকার করে নিতে পারেন নি। এইজন্যই তিনি অন্য যে কোন জমিদারের থেকে প্রকৃতিগতভাবে পৃথক ছিলেন। এদিক থেকে কবির জমিদারি ছিল অপেক্ষাকৃত

স্বতন্ত্র। তাই কবির জমিদারির ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই জমিদার কবির ব্যক্তি-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

এদিক থেকে কবি ব্যক্তি-জীবনে সত্যই তথাকথিত শোষক, হঠকারী ও প্রজাপীড়ক জমিদারের মতো ছিলেন কিনা—এ সম্পর্কে যথাযথভাবে ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে জানতে হলে জমিদার রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও আমাদের আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা কবির জমিদারির কিছু কথা এ প্রসঙ্গে জেনে নেবো।

আগেই বলেছি,রবীন্দ্রনাথের বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে পিতা দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের নির্দেশে তাঁকে জমিদারি পরিচালনার কাজে মনো-নিবেশ করতে হয়। উত্তরবঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারিটির দেখা-শোনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি এবার উত্তরবঙ্গে চলে আসেন এবং জমিদারির কাজের সুষ্ঠু পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। জমিদারির কাজ সুষ্ঠু-ভাবে যাতে সম্পন্ন করা হয় সেই দিকেও তিনি যত্নবান ছিলেন। যদিও এই সময় তিনি 'সাধনা' পত্রিকার জন্য রচনায় নিবিড়ভাবে ব্যাপৃত ছিলেন, তবুও সাংসারিক কর্তব্য অর্থাৎ জমিদারির দায়িত্বে এতটুকু অবহেলা দেখাননি। দুই কর্তব্যের মধ্যে একনিষ্ঠ সমঝোতা বজায় রেখে সাহিত্যকর্মের সাথে সাথে সাংসারিক কর্মও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি তরুণ প্রমথ চৌধুরীকে একবার লিখেছিলেন,

> আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্চে যখন যে কর্তব্য স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা। যে অবস্থার দ্বারা পরিবৃত হওয়া যায় সেই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উপস্থিত কর্তব্য সেইগুলো পালন করা। তাই আমি প্রতিমাসে নতশিরে 'সাধনার' লেখা লিখে যাচ্চি এবং প্রতিদিন জমিদারির সমস্ত খুচরো কাজ মনোযোগ পূর্বক

> করছি। অনেক সময় কষ্টবোধ হয়—কিন্তু আমার মনে হয় মোটের উপর আমার পক্ষে এই সবচেয়ে ভালো। কল্পনা নামক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আমার পক্ষে ভালো একসারসাইস্ নয়।[৬২]

জমিদারির কাজে মনোনিবেশ করার সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-পিয়াসী মনের দরজা কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে আসে, জমিদারি-কাজের বাস্তবতা এবার রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে ফুটে ওঠে। এইবারই তিনি সর্বপ্রথম গ্রামবাংলার জীবনের সাথে, সহজ-সরল বঞ্চিত-ব্যথিত মানুষজনের সাথে এবং তাদের ব্যাথা-বেদনা, শোক-দুঃখের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে থাকেন। জমিদারির দায়িত্বে এসেই তিনি জমিদারিতে এতদিন ধরে চলে আসা প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতিতে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। সাধারণ মানুষের উপর এতকাল যাবৎ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ জমিদারি প্রথার মাধ্যমে যে অবিচার ও অসাম্য চলে এসেছে তাতে তিনি শুধু অসন্তুষ্টই হলেন না, সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও তিনি যথেষ্ট যত্নবান হলেন। জমিদারিতে এতকাল ধরে বজায় থাকা বিভিন্ন প্রভেদমূলক প্রথা, বিধি-বিধান চাপিয়ে সাধারণ প্রজাকে অবদমিত ও অধীনস্থ করে রাখার ব্যবস্থাটিকে তিনি মোটেই ভালো চোখে দেখেন নি, বরং সেই ব্যবস্থাকে জমিদারির সুস্থ পরিচালনার পক্ষে ক্ষতিকর বলেই মনে করেছিলেন, কারণ এতে জমিদার ও প্রজার মধ্যে শোষক-শোষিতের বিভেদমূলক মানসিক অশান্তির সম্পর্ক গড়ে ওঠে; ফলে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে সুস্থ-সম্পর্কের পথে দুস্তর ব্যবধান। জমিদারি পরিচালনার স্বার্থেই জমিদার ও প্রজার এই ব্যবধান দূর করা একান্ত দরকার বলেই তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে জমিদারির কাজ-কারবার চলে আসছে তা সাধারণ প্রজার সঙ্গে

জমিদারের প্রত্যক্ষ সংযোগ বজায় রাখার পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিলনা ; কারণ, নায়েব, পেয়াদা, গোমস্তা, দারোয়ান পরিবেষ্টিত হয়ে জমিদারবাবু এক সীমাবদ্ধ বিলাসী জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাই সাধারণ প্রজাদের সাথে জমিদারবাবুর সরাসরি মেলা-মেশা কখনও হয়ে উঠত না। অনুরূপভাবে প্রজাসাধারণও তাদের দুঃখ-দুর্দশা, আনন্দ-বেদনার সংবাদ জমিদারবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে পারত না। ফলে তাদের মনে বেদনা ও ক্ষোভ সঞ্চারিত হওয়া যে স্বাভাবিক রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী মন সে-কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল। তাইতো জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বে এসে সর্বপ্রথমেই তিনি জমিদারির এতদিনকার প্রতিপালিত এইসব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাদির বেশ কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন, এবং তা করেছিলেন জমিদারিতে কর্মরত আমলাদের বিরোধিতা ও আপত্তি সত্ত্বেও। উদ্দেশ্য ছিল এই যে জমিদার ও প্রজার মধ্যে নৈকট্যের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে জমিদারির প্রশাসন সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা। এর ফলে প্রজাদের সাথে তাঁর সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা সে-সময় গল্পকথার মতো লোকের মুখে মুখে ফিরতো। 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লেখক শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় এ সম্পর্কে অনেক গল্পের উল্লেখ করেছেন। এমনই একটি বহুল প্রচলিত গল্প হল 'পুণ্যাহ' উৎসব সংক্রান্ত বহুকালের অনুসৃত এক বিভেদকামী প্রথার অবসান বিষয়ক। গল্পটি সংক্ষেপে মোটামুটি হল এই যে, [৬৩]

'পুণ্যাহ' হল জমিদারি কাছারীতে খাজনা জমা নেওয়ার প্রথম দিন অর্থাৎ পুণ্য অহং এবং বছরের ঐ দিনটিতে খাজনা জমা দেওয়াই ছিল তাই পুণ্যেরব্যাপার—এই বিশ্বাস সরল-প্রাণ প্রজাদের মধ্যে চালু করা হয়েছিল। আর যে প্রজা ঐ দিনে সর্ব প্রথমে খাজনা জমা দিত তাকে বলা হত 'পুণ্যাহ পাত্র', অর্থাৎ সেই প্রজাটিই খাজনা দেওয়ার বউনি করবে ; তারপরে অন্যান্য প্রজারা একে একে খাজনা দেবে। খাজনা

প্রথমে দিয়ে বউনি করার জন্য পুণ্যাহ-পাত্রকে জমিদারের তরফ থেকে কাপড়, চাদর, দই, মাছ, পান, সোলার মালা ও ফুল দেওয়া হত। তিনদিন ধরে চলত খাজনা দেওয়া নিয়ে খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনার এক মস্ত উৎসব ; এরই নাম পুণ্যাহ উৎসব। পুণ্যাহের দিন একটি বড় হলঘরে পাতা হত জমিদারের সিংহাসন, প্রজাদের জন্য পৃথক পৃথক বসার ব্যবস্থা। বাজনা-বাদ্যের মধ্য দিয়ে জমিদারবাবু সিংহাসনে বসতেন ; ঈশ্বরের নাম ক'রে তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ চাওয়া হত। এরপরে পুরোহিত মশাই উপস্থিত প্রজাদের কপালে আশীর্ব্বাদ-টিকা পরিয়ে দিতেন। জমিদারবাবু তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন। তাদের সাথে প্রত্যক্ষ দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে জমিদার-বাবুর পক্ষে এই পুণ্যাহই ছিল এক মস্ত সুযোগ। আর প্রজারাও এই দিনটির জন্যই সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ফলে পুণ্যাহই জমিদারির একটি বহু আকাঙ্খিত উৎসব।

শিলাইদহের জমিদারি কাছারীতে পুণ্যাহ উৎসবে প্রথমবার এসেই কবি বিচলিত হলেন! তিনি দেখলেন পুণ্যাহ উৎসবে সমবেত প্রজাসাধারণের জন্য যে বসার আসন পাতা হয়েছে তার মধ্যেই মানুষে মানুষে সমস্ত প্রভেদ রাখা হয়েছে ; যেমন জমিদারের জন্য রয়েছে সিংহাসন, ধনী প্রজার জন্য এক ধরনের আসন, গরীব প্রজাদের জন্য পৃথক আসন ; আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বর্ণের মানুষের জন্য পৃথক পৃথক আসন। পুণ্যাহ উৎসবে সমবেত প্রজাসকলের বসার আসনের মধ্যে এই যে ব্যাপক ভেদাভেদ —তাতে জমিদার-রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মপীড়া বোধ করলেন, কারণ মানুষে মানুষে এত দূরত্ব বজায় রেখে কোন উৎসবই পুণ্য-উৎসবে পরিণত হতে পারে না—একথা তিনি বুঝেছিলেন।

জমিদার-কবি (রবীন্দ্রনাথ) বাজনা-বাদ্য ও অসংখ্য অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে উৎসব-বাসরে হাজির হলেন বটে, কিন্তু তিনি আসন গ্রহণ করলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন দৃঢ় ভাবে। সবাই তো অবাক! কী

ব্যাপার! বাবুমশাই (কবিকে প্রজারা বাবুমশাই বলেই সম্মান জানাতো) বসছেন না কেন! কবি এবার জানালেন, মানুষে মানুষে বসার আসনের এই প্রভেদ রাখা চলবে না; এই ব্যবস্থা অবশ্যই তুলে দিতে হবে। এবার তো আর এক চোট্ চমক। নায়েব, গোমস্তা, ম্যানেজারদের চোখ তো কপালে উঠল। আর প্রজারাও রীতিমত অবাক! কারণ এই ধরণের ব্যবস্থাই তো তারা দেখে আসছে বছরের পর বছর। নায়েব-ম্যানেজারেরা কবির কথায় বিরক্ত বোধ করেন, কারণ বহুকাল ধরে অনুসৃত বসার আসনের এই ধরণের ব্যবস্থাপনামূলক প্রথাটি যদি তুলে দেওয়া হয় তবে জমিদারির আভিজাত্য যে নষ্ট হয়ে যাবে। তারা কবির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, এবং অবশেষে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হলে তারা কাজ ছেড়ে চলে যাবেন বলেও হুম্‌কি দেন। কিন্তু কোনও হুম্‌কি বা আপত্তি কবির সমতাবাদী সংবেদনশীল দৃঢ় মানসিকতাকে এতটুকু দুর্বল করতে পারে নি। সবাই মিলে সেদিন তরুণ জমিদারকে বহুদিনের প্রতিপালিত এই ব্যবস্থা না তুলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু সব অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হল। কবি সকলের জন্য সমান আসন প্রচলনের ব্যাপারে দৃঢ় রইলেন। অবশেষে তাই করতে হল। ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, হিন্দু-মুসলমান, জমিদার-প্রজা--সবাই মিলে এবার বসলেন বিশাল ফরাসের উপর! শুরু হল কবির জমিদারি আমলেরপ্রথম সমতাবিধায়ক 'পুণ্যাহ' উৎসব। এতদিনকার বিভেদমূলক প্রথার বিলোপ ঘটল এবার। কবির এই সমতাবাদী মনের পরিচয়ে প্রজাসকল তখন সুস্থ জমিদারি-শাসনের নিশ্চয়তা পেল।

আসলে জমিদারি শাসন বলতে মূলতঃ বোঝায় জমিদারের নামে নায়েব, ম্যানেজার প্রভৃতি আমলাদেরই শাসন। তারাই নিজেদের মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তির স্বার্থে জমিদারি শাসনের নামে এ-ধরণের বিভেদমূলক বিধি-বিধান চালু করে থাকেন। আর

জমিদারের কাছ থেকে প্রজাদের যে কোনও প্রকারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা সহজ। তারা জমিদারকে সর্বদাই (নিজেদের) এমন নৈকট্যের নিগড়ে (পরিমণ্ডলে) বেষ্টন করে রাখেন যাতে প্রজারা সহজে জমিদারের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তুলতে না পারে এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান গড়ে ওঠে। আর এই ব্যবস্থা বা মানসিকতা শিলাইদহের জমিদারিতেও ছিল। কিন্তু কবি জমিদারিতে এসে এ ধরণের ব্যবস্থা একটার পর একটা তুলে দিতে শুরু করলেন।

প্রজারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জমিদারবাবুকে সরাসরি জানাতে চাইত; কিন্তু আমলাদের পরিমণ্ডল ভেদ করা সহজ-সাধ্য ছিল না। খাজনা দেওয়া, অর্থসংকট, কন্যাদায় প্রভৃতি বিষয়ে কারো কোন সমস্যা থাকলে সেই বিষয়ে জমিদারবাবুর কাছে আবেদন জানাবার কোন সুযোগই তারা পেত না; ম্যানেজার, নায়েব পেয়াদাদের চাপে প'ড়ে যেভাবেই হোক তাদের খাজনা মেটাতে হত। এই রকম হাজার সমস্যা ছিল প্রজাদের। তারা বাবুমশাইকে (কবিকে) সামনা-সামনি ধরার জন্য ও তাঁর সাথে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত, যাতে তাদের সমস্যার কোন সুরাহা হয়। এ ব্যাপারে জমিদারী আমলাদের ব্যূহ ভেদ করে কবির সঙ্গে প্রজাদের দেখাসাক্ষাত করার মরীয়া প্রচেষ্টা সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। এমনই একটি গল্প আছে কবির সাথে গরীব ব্রাহ্মণ শিরোমণি চক্রবর্তী মশাই-এর সাক্ষাতের এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা বিষয়ে; ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা এই কারণেই বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি যে তাহলেই কবির প্রজা-দরদী, মানবতাবাদী মনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেলেও যেতে পারে। ঘটনাটি হল মোটামুটি এই যে,[৬৪]

চক্রবর্তী মশাই ছিলেন গরীব পুরোহিত; বাড়ী বাড়ী পূজা-পাঠ করেই সংসার চালাতে হয় তাকে, অতি কষ্টে। তার জমি-জমা কিছুই ছিল না; বরং ছিল এক বড় সংসার। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে

এই সংসার চালানো তার পক্ষে ক্রমশঃ দায় হয়ে দাঁড়ালো। এমত বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তিনি বাবু মশাই-এর (কবির) সাথে একটিবার দেখা করার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন; তাঁকে তার দুঃখের কাহিনী জানালে যদি তিনি (কবি) কোন সুরাহা করে দেন—এই আশায়। কিন্তু বাবুমশাই-এর সাথে তার দেখা হওয়ার পথে বিস্তর সমস্যা। একেই তো বাবুমশাই-এর বোট-নৌকা নদীর জলে ভাসমান অবস্থায় বাঁধা আছে। তার উপর আবার নায়েব, পেয়াদা, চৌকদার দারোয়ানের কড়া নজরদারির সমস্যা। চক্রবর্তী মশাই ভেবেই আকুল। অথচ বাবুমশাই এর সাথে দেখা না করলেই যে নয়। অবশেষে সাত পাঁচ ভেবে তিনি দুর্গানাম স্মরণ ক'রে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে বাবুমশাই-এর কাছে পৌছাবার মরীয়া প্রচেষ্টা চালান। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। তারপরে কবির নির্দেশে মাঝিরা নৌকার কিনারা ধরে ঝুলে থাকা চক্রবর্তী মশাইকে তুলে এনে তাঁর সামনে হাজির করল। চক্রবর্তী মশাই তো এরকমটাই মনে মনে চেয়েছিলেন। কবি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এসবের মানে কি? তিনি সকাতরে বললেন, বাবুমশাই, পূজো-আর্চ্চা করে সংসার তো আর চলে না, তাই আপনার শরণ নিয়েছি। কবি রসিক ব্রাহ্মণের এই দুঃসাহসিক অভিযানে হেসেই আকুল। সাথে সাথে চক্রবর্তী মশাই-এর প্রতি তাঁর দরদী মনটি এবার আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। চক্রবর্তী মশাই নিজের পেশায় কতটা পারদর্শী—একথা কবি জানতে চাওয়া মাত্রই তিনি তার জানা সমস্ত মন্ত্র গড় গড়িয়ে আওড়ে গেলেন—গনেশ পূজো, দূর্গা পূজা চণ্ডীপাঠ সবকিছুর মন্ত্র। বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে শুনে শুনে রপ্ত করা এইসব মন্ত্রাদি চক্রবর্তী মশাই হাত পা নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে আওড়ে গেলে কবি খুসী হয়ে রসিক ব্রাহ্মণকে 'শিরোমণি মশাই'—এই রসের উপাধি দিলেন, এবং সাথে সাথে তাকে পাঁচ বিঘা জমি 'বিনানজরে' দান করলেন। শিরোমণি চক্রবর্তী মশাই-এর দুঃখের দিন এবার কেটে গেল।

'পুণ্যাহ উৎসব' ও কবির সাথে শিরোমণি মশাই-এর সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত গল্প বা ঘটনার[৬৫] মতো এমন আরো এমন কিছু গল্প-কাহিনী আছে[৬৬] যেগুলি থেকে কবির প্রজাদরদী ও পরার্থপর মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য শিরোমণি চক্রবর্তী মশাই-এর প্রতি কবির বদান্যতা তাঁর মানবিকতাবোধেরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শুধু শিরোমণি মশাই কেন, যখন যে প্রজার দুঃখ-দুর্গতির কথা শুনেছেন জমিদার-কবি সেই দুর্গতি মোচনের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-জীবনী পড়তে পড়তে এমন ঘটনা কখনও চোখে পড়েনি যে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোন প্রজা বিপাকে পড়েছে অথবা জমিদার হিসাবে তিনি প্রজাদের উপর অন্যায়-অবিচার করেছেন।[৬৭] বরং প্রজাদের স্বার্থে জমিদারির ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি প্রজাহিতৈষী কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখিকা গীতা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

> ঠাকুরবাড়ি জমিদারী এলাকায় বিরাট বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যখন প্রজারা কষ্টে পড়ল তখন কবি বহু চেষ্টায় সকল শরিককে বুঝিয়ে এক লক্ষ টাকা খাজনা মাপের হুকুম দিয়েছিলেন তাঁদের জমিদারীতে, সেকালের প্রজারা সেকথা ভুলতে পারেনি।[৬৮]

আসলে, কবির একটা সহানুভূতিশীল মন ছিল। আর সেই মনের প্রকাশ তাঁর সারা জীবন ধরেই ঘটে এসেছে; জমিদার হিসাবে তাঁর কার্যকলাপে তো তা ঘটেইছে। প্রজাকূলের স্বার্থ রক্ষাকারী জমিদার হিসাবে কবির ভূমিকা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী অত্যন্ত খোলামনে মন্তব্য করেছেন,

> রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ জানি,—কেননা তাঁর জমিদারি-সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি

> করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাংলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমন unique।...[৬৯]

প্রজা-সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার ব্যাপারে কবি সত্যিই unique জমিদার ছিলেন এবং অন্য যে কোন স্বার্থান্ধ জমিদারের মতো তিনি হৃদয়হীন ও অমানবিক ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হননি। দরিদ্র ও দুর্গত প্রজাদের অভাব-অভিযোগকে তিনি তাঁর জমিদারিতে সাধ্যমত দূর করারও চেষ্টা করেছেন। আর সে চেষ্টা সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন; তিনি বলেছেন,

> জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা (অর্থাৎ যে লোক মহাজন), অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই।...একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টে'কে না। **আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করিনি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেছি।**[৭০]

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজনের প্রতি জমিদার কবির ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-বেদনার প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি। তাদের প্রতি তাঁর এই নিবিড় আন্তরিকতা তিনি জমিদারি অভিজ্ঞতার সূত্রেই লাভ করেছিলেন।

আসলে, তিনি জমিদারির কাজে শিলাইদহ, কালিগ্রাম, সাহাজাদপুর, পাতিসর প্রভৃতি গ্রামে-গঞ্জেও বিস্তর ঘোরা-ফেরা করেছেন; ফলে গ্রাম বাংলার জন জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করার মস্ত সুযোগ পেয়েছেন, বিশেষ করে জমিদারির রায়ত ও চাষীদের জীবন-ধারা সম্পর্কে তিনি নিটোল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাইতো পল্লী-বাংলার শ্রমিক, মজুর, কৃষক, সাধারণ মানুষজনের প্রতি কবি ছিলেন আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল। 'আত্মপরিচয়ে' তাইতো তিনি লিখেছেন,

> 'এই ধূলো-মাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।[৭০ক]

এ বক্তব্য কবির নিছক ভাবালুতা নয়, জন-দরদীমনের আকুল আর্তি। সাধারণ মানুষের প্রতি কবির এই যে আকুলতা তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁরই শ্রীনিকেতনের একটি ভাষণে, সেখানে তিনি বলেছেন,

> আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্যদিকে এইসব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে।[৭০খ]

পল্লী-বাংলার সাধারণ জন-জীবনের প্রতি কবির এই যে সহানুভূতি তাতে এতটুকু খাদ ছিলনা, বরং ছিল নিবিড় আন্তরিকতা। তাইতো আমরা দেখি যে "কৃষকদের দুর্দ্দশা লাঘব করার জন্য তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পাতিসরে এবং পরে শিলাইদহে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন

করেছিলেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের উদ্ধার করবার জন্য শতকরা ৮% হারে ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা (১ লক্ষ্য ৮ হাজার) কৃষিব্যাঙ্কে জমা রাখেন এবং কৃষকদের কল্যাণে উৎসর্গ করেন। এতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামের কৃষকদের কত বড় প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।[৭০গ]

ব্যক্তি-মানুষ রবীন্দ্রনাথ

সুতরাং জমিদার হিসাবে কবি যে অন্যান্য জমিদারদের থেকে প্রকৃতিগতভাবে—স্বতন্ত্র ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। শুধু জমিদার থাকা কালেই নয়, জমিদার না থাকা কালেও তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে সমধিক যত্নবান ছিলেন, এবং তাদের দুস্থ জীবন-যাত্রার প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। ঘটনাটি হ'ল এইরকম ঃ

তখন ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় মধ্য লগ্ন। ১৯১৬ সাল। যুদ্ধের পথ বেয়ে সেবার দেখা দিল বাঁকুড়ায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। কবির মন বিচলিত হয়ে উঠল। দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনাহার ক্লিষ্ট, দুর্গত মানুষদের দুর্দশায় 'হৃদয়বান কবি' স্থির থাকতে পারলেন না। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের সাহায্যের জন্য কবি অর্থ-সংগ্রহ অভিযানে বের হলেন। তাঁর রচিত 'ফাল্গুনী' নাটকটি মঞ্চস্থ ক'রে টিকেট বাবদ অর্জিত সমস্ত অর্থ তিনি সে'বার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যে দান করলেন।[৭১] এ কবির শুধু মহানুভবতা নয়, হৃদয়স্পর্শী মানবতাও বটে।

কবির এই মানবতাবোধের বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি কখনও নিস্পৃহ-উদাসীন ছিলেন না; সাধারণের দুঃখে তিনি নির্বিকার, নির্লিপ্ত থেকে গেছেন—এমনটিও

নয়। বরং তাদের দুঃখ-বেদনায় তিনি সমান আহত হয়েছেন, তাদের শোকে ব্যথিত হয়েছেন, নইলে কি আর বিশিষ্ট 'নাইট' (knight) উপাধিটি অবলীলায় ত্যাগ করতে পারতেন! সেটা ছিল ১৯১৯ সাল। ১৩ই এপ্রিল। পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সেদিন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ নর-নারী, শিশু-কিশোরদের সমাবেশ ঘটেছিল। সমাবেশ প্রাঙ্গণটি ছিল চতুর্দিক ঘেরা; সেখান থেকে বের হওয়ার মাত্র একটি পথই ছিল। আর ঐ একটি পথ দিয়েই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সৈন্যবাহিনী সমাবেশপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। তারপর জেনারেল ও' ডায়ারের (General O' Dyer) নির্দেশে নিরস্ত্র, অসহায় জনতার উপর ১৬০০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। অসংখ্য নর-নারী হতচকিত হয়ে নিরুপায়ের মতো মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হল।[৭২] কবির হৃদয় এ সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি প্রস্তাব করলেন :

> অবিলম্বে একটি প্রতিবাদ-সভা ডাকা হোক; আর কেউ তার সভাপতি হতে না চান তো তিনিই তার সভাপতি হবেন।[৭৩]

তিনি আরো লিখলেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।"

শুধু দেশপ্রেম নয়, মানবপ্রীতিও সাথে সাথে কতখানি গভীর হলে সেদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এত বড় চওড়া মাপের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে—ভাবুন তো একবার! শুধু প্রতিবাদ করাই নয়, এমনকি তিনি ব্রিটিশের দেওয়া সম্মানীয় 'নাইট' উপাধি নির্দ্বিধায় ত্যাগ করলেন। এ ব্যাপারে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে তিনি সরাসরি লিখলেন,

> কয়েকটা স্থানীয় বিক্ষোভ দমন করার জন্যে সরকার পাঞ্জাবে যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলির ভয়াবহতা, ভারতস্থ ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে আমাদের অবস্থা যে কত অসহায় তা রূঢ় চমক দিয়ে আমাদের

বুঝিয়ে দিয়েছে।…যে কোনো সভ্য দেশের ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না।…এটার সপক্ষে রাজনৈতিক প্রয়োজনের কোনো দোহাই পাড়া চলে না, এর কোনও নৈতিক সাফাই নাই।…পাঞ্জাবে আমার ভাইয়ের উপর যে অবমাননা ও উৎপীড়ন করা হয়েছে তার বিবরণ মুখ বাঁধা নীরবতা ভেদ করে চুঁইয়ে বেরিয়েছে, ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। এর জন্য আমার দেশবাসীর হৃদয়ে সার্বজনিক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, আমাদের শাসকবর্গ তা গ্রাহ্য করেন নাই।…এ ক্ষেত্রে, আমি আমার দেশবাসীর হয়ে সামান্য যা করতে পারি তা হচ্ছে— আমার আতঙ্ক-বিমূঢ় লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অন্তরের প্রতিবাদকে ভাষা দেওয়া, তার ফলে আমার যা হবার তা হোক্।…এখনকার অবমাননার এই অসঙ্গত পটভূমিতে সম্মান-সূচক অভিজ্ঞানগুলো আমাদের লজ্জাকে বড় বেশী স্পষ্ট করে তোলে। তাদের তথাকথিত তুচ্ছতার জন্যে যাদের অ-মানুষোচিত অবমাননা সহ্য করতে হয়, আমি আমার সেই দেশের লোকের পাশেই দাঁড়াতে চাই। এই সব কারণে আমি বেদনার সহিত আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার এই 'নাইট' উপাধি হতে আমাকে মুক্ত করা হোক।[৭৪]

এ কবির নির্ভেজাল দেশপ্রেম সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এটা তাঁর আন্তরিক মানবপ্রীতির আকুল-আকুতিও বটে। দুর্দিনে জন-সাধারণের পাশে দাঁড়াবার এই যে দৃঢ় মানসিকতা তা কবির অতলান্ত মানবতাবোধেরই সার্থক পরিচায়ক। তার এই উপাধি ('নাইট') বর্জনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণ-পীড়নের

কঠোরতা এতটুকু কমেছিল কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে জন-জীবনের বেদনায় তাঁর হৃদয়ে কতটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তা এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এর মধ্যে যে স্বার্থপর, দুর্বিনীত, শোষক মানুষের কুচক্রী প্রবণতা লুকিয়ে নেই তা বলাই বাহুল্য।

কবির এই অন্যায়ের সাথে আপোষবিহীন মানসিকতা ও সুগভীর মানবপ্রীতিই তাঁর জীবনাচরণের মূল বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সংঘটিত ব্রিটিশ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে কবি যেমন অত্যাচারিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক অনুরূপ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন অত্যাচার আর অপশাসনের বিভিন্ন ঘটনায়। এ রকমই একটি ঘটনা হল মেদিনীপুরের হিজলী কারাগারের হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপকতার দিক থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সমতুল না হলেও হত্যাকাণ্ডের প্রকৃতির দিক থেকে দুটির মধ্যে কোনও তফাৎ ছিল না। কবির অন্যায়-বিরোধী মানসিক দৃঢ়তা ও সুগভীর মানবপ্রীতির পরিচয়ের স্বার্থেই হিজলীকারাগার হত্যাকাণ্ড ও তৎসম্পর্কিত তাঁর মানসিকতা সংক্ষেপে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

সেটি ছিল ১৯৩১ সাল। সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখ। দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার বইছে তখন মেদিনীপুর জেলায়। বাংলাদেশের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান-স্বরূপ এই মেদিনীপুর জেলাকে দমন করার ব্যাপারে ব্রিটিশ শক্তি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। যে কোন রকম আন্দোলনমুখী কার্য্যকলাপকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য পুলিশবাহিনী ছিল অত্যন্ত তৎপর। তাই দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য পুলিশ ব্যাপক ধর-পাকড় চালালো। গ্রেপ্তার করা হল আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে জড়িত বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে। গ্রেপ্তার হওয়া বেশ কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে (মেদিনীপুরের) হিজলী কারাগারে রাখা হল।

সামান্য অজুহাতে পুলিশ তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলিতে জখম হন বহু বন্দীবীর। নিহত হন শহীদ সন্তোষ মিত্র ও ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। এই পুলিশী হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ডটির দশ দিন পরে এক জনসভা আহুত হয়। কলকাতার মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিবাদ-সভা। লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে এই সভায়। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বয়ং উপস্থিত হন কবি রবীন্দ্রনাথ। মানবদরদী কবির মনে হিজলী কারাগার হত্যাকাণ্ডের দরুন এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই সেই হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়ে এবং ব্রিটিশের প্রজাস্বার্থ বিরোধী কাজকে কঠোরভাবে সমালোচনা ক'রে কবি তাঁর ভাষণে বলেন,

> এতো বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক, কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না, ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।
>
> যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতে হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে, সেই সব শাসনকর্তা

> এবং তাঁদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।
>
> 'এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছু নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়-পরায়ণতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বোধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি?[৭৫]

ব্রিটিশের অপশাসনের বিরুদ্ধে কবির এই অর্থবহ সতর্কবাণী ব্রিটিশের প্রজাপীড়নকারী মানসিকতাকে হয়ত এতটুকুও পরিবর্তিত করতে পারেনি, কিন্তু তবু এই প্রকাশ্য বাণী-বিবৃতিতেই রাজপুরুষদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানানোর সৎসাহস ফুটে উঠেছে এবং অন্যদিকে প্রজা-সাধারণের দুঃখ-শোকের একজন অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে তাঁর আকুল আর্তিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কত বড় মানবপ্রেমী ও সংবেদনশীল মানুষ হলে তবেই এমন বড় মাপের কাজ করা যায় তা ভাবতেও অবাক লাগে। কবির এই শোষণ-বিরোধী, সহানুভূতিশীল ও মানবতাবাদী মানসিকতা সম্পর্কে প্রভাত চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন,

> দুর্বল, অসহায়ের প্রতি সবলের যে পীড়ন, তাতে বীর্য নেই, আছে নিষ্ঠুরতা, মর্মান্তিকতা এবং পৌরুষের

> লজ্জাকর গ্লানি। একথা রবীন্দ্রনাথ আজীবন কতোভাবেই বলে গেছেন।[৭৬]

প্রকৃতপক্ষে, মনেপ্রাণে একজন খাঁটি মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলেই কবি মানবতার উপর আঘাতের বিরুদ্ধে—দুর্বলের উপর সবলের শোষণের বিরুদ্ধে—সর্বদা সক্রিয় ও সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বগোলকের যে কোন অংশের সাধারণ মানুষের উপর যখনই সবলের দমন-পীড়ন চলেছে, কবির লেখনীও তখন ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে তাইতো তিনি সরব হয়ে ওঠেন; জ্বালাময়ী ভাষায় সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করেন। সবলের অত্যাচার ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে কবির দৃঢ় মানসিকতা সম্পর্কে মনোজ বসু লিখেছেন,

> আমেরিকায় নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষের উপর চাবুক মারা, জার শাসিত রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ানদের অত্যাচার, স্পেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসি আক্রমণ, হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার—কোন অন্যায় কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।[৭৭]

তাইতো স্পেনের ফ্যাসিবাদের চাপে সাধারণ মানুষের দুর্দশায় কবি শুধু ব্যথিতই হননি, ক্ষোভেও ফেটে পড়েছেন চূড়ান্তভাবে। সেটা ছিল ১৯৩৬ সালের জুলাই মাস। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের আশ্রয়ে প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের উপর নিষ্ঠুর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চালান;[৭৮] কবি তখন এই বর্বরোচিত অভিযানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন এবং স্পেনের গণতন্ত্র-প্রেমী জনগণকে সাহায্য করার আকুল আহ্বান জানান,

> স্পেনীয় জনগণের এই চরম দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে আমি মানবতার বিবেকের কাছে আবেদন করছি। স্পেনের গণ-ফ্রণ্টকে সাহায্য করুন, জনগণের সরকারকে

সাহায্য করুন, লক্ষ-কণ্ঠে গর্জে উঠে বলুন প্রতিক্রিয়ার 'অবসান' ঘটাও, গণতন্ত্রের সাহায্য-কল্পে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাফল্যের স্বার্থে আপনারা লক্ষে লক্ষে এগিয়ে আসুন।

["In this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscieuce of humanity. Help the people's Front in Spain, help the Government of the people, cry in million voices 'Halt' to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilisation and culture"][৭৯]

অনুরূপ ভাবে, বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে আবিসিনিয়ার উপর ইতালীর ফ্যাসিবাদী আক্রমণেরও তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন কবি। জঙ্গী-নেতা মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালী যখন দুর্বল আবিসিনিয়ার অসামরিক জনগণের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করল তখন তিনি মুসোলিনির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আবার চীনের উপর জাপানের ফ্যাসিবাদী আক্রমণকেও কবি কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। সালটি ছিল ১৯৩৭ সাল। চীনের উপর জাপ-আক্রমণ শুরু হল। ২১ সেপ্টেম্বর জাপানী বোমারু বিমান নানকিং ও ক্যান্টনের উপর বোমা বর্ষণ করে। চীনের সমর্থনে কংগ্রেস দলের নেতা জওহরলাল নেহরু ২৬শে সেপ্টেম্বর ভারতে 'চীন দিবস' পালনের আন্তরিক আহ্বান জানান। কবি তা সমর্থন জানান সর্বান্তঃকরণে। সারা ভারতে তাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধিকৃত হল 'চীন দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে। চীনের সাহায্য উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বামপন্থিগণ সাহায্য তহবিল গড়ে তুললে কবি তাতে ৫০০ টাকা (সেই সময়ে) দান করেন। এদিকে যুদ্ধের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। তখন ১৯৩৭

সালের ডিসেম্বর মাস। একে একে সাংহাই, নানকিং-এর পতন ঘটে। যুদ্ধের পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বার্ট্রান্ড রাসেল, রোঁম্যা রঁল্যা, জন ডিটরী, আইনষ্টাইন প্রমুখ বিশ্ব-বুদ্ধিজীবিগণ চীনকে সার্বিক সাহায্য দানের জন্য আকুল আবেদন জানান। কবি এতে উদ্বেলিত হলেন। আন্তরিক ভাবে সেই আবেদনে তিনি সাড়া দিলেন এবং বল্লেন,

> মানুষের ইতিহাসে এই দানবিকতাই কি শেষ কথা? মানুষের মধ্যে এই যে অসুর এই কি সত্য? এই সংঘাতের অন্তরে অন্তরে কাজ করছে শান্তির প্রয়াস, সে কথা বুঝতে পারি যখন দেখি, দুঃখের দিনেও কত মহাপুরুষ দাঁড়িয়েছে শান্তির বাণী নিয়ে—সে জন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। এঁদের সংখ্যা বেশী নয়, সাম্রাজ্যলুব্ধরা এঁদের হিংসা করে মরে—তবু এঁদের শক্তিকে নিঃশেষ করতে পারবে না। এখনো মানুষ বিপদকে স্বীকার করেও দূর ভবিষ্যতের বাণী বহন করে চলেছে অকুতোভয়ে। সত্য এখানেই।[৮০]

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবির এই যে সীমাহীন বিতৃষ্ণা এবং সেই আগ্রাসনের প্রতিরোধকারী মানবিক প্রয়াসের প্রতি তাঁর এই যে অসীম আকুলতা তার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর শোষণবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিমুখ উদার মানসিকতা এবং মানবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। আর সেই শ্রদ্ধা-বোধের জন্যই ব্যক্তি-জীবনে নিজে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়েও সাধারণ মানুষকে ভালোবেসেছেন অন্তর দিয়ে, তাদের কথা লিখেছেন নিবিড় মমতা দিয়ে।

প্রকৃত পক্ষে, কবি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মানবতাবাদী। সমস্ত রকম মানবতাবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো চামড়ার মানুষ-জনের প্রতি শ্বেতকায়দের সীমাহীন

দুর্ব্যবহারের ঘটনাতেও তিনি যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে তরুণ গান্ধীজী সেখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন; কবি সেই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনকে স্বচক্ষে দেখা ও তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য গোখেল, এণ্ড্রুস, পিয়ারসন প্রমুখগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। কবি সাথে যেতে না পারার বেদনা প্রকাশ ক'রে এণ্ড্রুসকে লিখলেন,

> শ্রীযুক্ত গান্ধী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আফ্রিকায় আপনারা যে আন্দোলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন তাতে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি গ্রহণ করুন।[৮১]

আসলে, এরকম যে কোন জন-বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে কবি ছিলেন সক্রিয় ও সরব, যা কখনও কোন স্বার্থান্ধ, শোষক বুর্জোয়া মানুষের কাছ থেকে আশা করাই যায় না। তাইতো সাম্রাজ্যবাদী, বিভেদকামী বিশ্বযুদ্ধকে কবি শুধু সমালোচনাই করেন নি, যুদ্ধবাজদের স্বার্থান্ধ, মানবতাবিরোধী, পরশ্রীকাতর ও সাম্রাজ্যলোভী মানসিকতার বেদীমূলেও তিনি কুঠারাঘাত করেছেন, বলেছেনও এমনকি যে,

> যারা অসহায়দের উপর অবমাননার বোঝা চাপায় শুধু তাদেরই যে নৈতিক অবনতি ঘটে, তা নয়, যাদের অবমানিত করা হয়, তাদেরও ঘটে! · আমাদের ভয় পেলে চলবে না, নৈতিক পরাজয়কে আমরা স্বীকার করে নেব না; তবে, আমাদের চিত্তে প্রতিহিংসার কুৎসিত স্বপ্ন পোষণ করব না।[৮২]

জনস্বার্থ-বিরোধী ও মানবতা-বিমুখ কাজের বিরুদ্ধে কবি তাই ছিলেন যেমন দুর্বার, তেমনি জনহিতকর কাজের পক্ষেও তিনি ছিলেন

সমধিক দুর্নিবার। মানবতামুখী যে কোন কাজের প্রতিও ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। মানুষে মানুষে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা-সহানুভূতির কথা তিনি সারা জীবন ধরে প্রচার করে গেছেন। মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক, ভালোবাসুক বিশ্বমানবতাকে—এটা কবি আন্তরিক-ভাবে চাইতেন। মানুষের উপর মানুষের অন্যায় আধিপত্য, শোষণ-বঞ্চনার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। মানুষ যাতে মনুষ্যত্বের মহৎ মহিমা উপলব্ধি করতে পারে, যাতে মানবতাকে অবজ্ঞা করতে না পারে তার জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল সর্বদাই আন্তরিক। একের সাথে অপরের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য নিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধ গড়ে উঠুক—এটাই ছিল কবির অন্তরের বাসনা। বিশ্ব-মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটানো এবং মানুষের সাথে মানুষের সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে কবি আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। আর সেই প্রচেষ্টার সার্থক ফসল হল বিশ্বভারতীর স্থাপনা।

বোলপুরের শান্তিনিকেতনে বহুবছর আগে ১২৯৮ সালে ৭ই পৌষ তারিখে কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সক্রিয় প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন আশ্রমের আদর্শে গড়া এক ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়া এক ধর্মোপাসনা-মন্দির। এবার কবি এই শান্তিনিকেতনে 'সর্বমানবের যোগ-সাধনের সেতু' হিসাবে গড়ে তুললেন 'বিশ্ব-ভারতী' বা জগতের জ্ঞান-সংস্কৃতির পীঠস্থান: 'বিশ্ব' অর্থাৎ জগত, আর 'ভারতী' হল জ্ঞান সংস্কৃতি।'[৮৩]

সেটা ছিল ১৯২১ সাল। ডিসেম্বর মাস। বিশ্বমৈত্রীর পটভূমিতে বোলপুরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন কবি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতির মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত

ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।[৮৪]

কবির এই বিশ্বভারতীই ছিল জন-সাধারণর জ্ঞান-চর্চার আদর্শ স্থান; সেটি বিশেষ কোন দেশের মানুষের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না, ছিল বিশ্বমানবতার শিক্ষা-নিকেতন। সেই শিক্ষায়তনে ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, উচ্চ-নীচ ভেদ ছিলনা, ছিলনা মানুষে মানুষে অসাম্য ও ভেদাভেদ। কারণ মনুষত্বের মহৎ মহিমা তুলে ধরার জন্য সব মানুষের প্রতি সমতার আদর্শ কবি তুলে ধরেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে।

কবির বিশ্বভারতী শুধু শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না, ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চ্চার পীঠস্থানও; মানুষের সাথে মানুষের মেলামেশার তীর্থক্ষেত্রও ছিল এই বিশ্বভারতী। এই উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিনিকেতনে এক বাৎসরিক বিশ্বমেলার আয়োজন করেছিলেন। যদিও শান্তিনিকেতনে মেলার সূচনা করেছিলেন তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তবে সে মেলা ছিল ধর্মীয় মেলা, ধর্ম-উপাসকদের মিলন ক্ষেত্র; মহর্ষিদেব তাঁর আয়োজিত মেলা বিষয়ক ট্রাষ্টডীডে পরিষ্কার করে লিখে গেছেন যে,

> ধর্মজ্ঞান উদ্দীপনের জন্য ট্রাষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাতপুরুষেরা আসিয়া ধর্মপ্রচার ও ধর্মালাপন করিতে পারিবেন।...[৮৫]

ট্রাষ্ট্রীডের এই বক্তব্য একথা পরিষ্কার করে দেয়, মহর্ষিদেব যে মেলার আয়োজন করেছিলেন তা মূলতঃ ধর্মীয় মানুষজনের মেলা। কিন্তু তাঁর আয়োজিত এই ধর্মমেলাকে সম্প্রসারিত ক'রে কবি শান্তিনিকেতনে এবার যে বিশ্বমেলার আয়োজন করেন তা ছিল সর্বসাধারণের মেলা—মানুষে মানুষে আত্মীয়তা গড়ে তোলার প্রাণ-কেন্দ্র। লেখিকা সাধনা কর এ ব্যাপারে যথার্থ ই বলেছেন,

> মহর্ষিদেব ধর্মসাধকদের নিয়ে উৎসব শুরু করেছিলেন,
> গুরুদেব সেই উৎসবে ডেকে আনলেন বিশ্ববাসীকে।[৮৬]

মহর্ষিদেব আয়োজিত মেলার সংস্কার সাধন করে কবি এবার এই সম্প্রসারিত মেলার মধ্য দিয়েই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আত্মিক সংযোগ বজায় রেখেছিলেন, যা কখনও স্বার্থসর্বস্ব, শোষক বুর্জোয়া মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায়না। এই মেলার লক্ষ্যই ছিল আপামর জন-সাধারণের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া। কবি বুঝেছিলেন যে ভদ্র, শিক্ষিত ও ধনী শ্রেণীর সাথে সাধারণ মানুষের সংযোগ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সভা-সমিতিতে উপস্থিত হয়ে সে যোগ সম্পূর্ণ করা যায়না। তাই প্রয়োজন এই ধরণের মহা-মিলন-মেলা। তাইতো "শান্তিনিকেতনে (মেলায়) শিক্ষিত-অশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ সবার সমাগমের আয়োজন রয়েছে।"[৮৭]

সর্ব-সাধারণ জনগণের প্রতি সমতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ব-মানবতার এই পবিত্র মিলন-মেলার আয়োজন করতে গিয়ে কবি লিখেছেন,

> আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ্য হইতে পারে…এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া দেশব্যাপী মঙ্গল-ব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে (এই মেলায়) তাহারই আভাস দেওয়া গেল।
> আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে তাহাদের অধিকাংশ আজকাল দূষিত হইয়া কেবল যে লোক-শিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষার আকর হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমাদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।[৮৮]

আর তাইতো তিনি আয়োজন করলেন এই পবিত্র মিলন-মেলার, যেখানে দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের মানুষ এসে সমবেত হন, মিলিত হন, হন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ। এইখানেই মেলাটির সার্থকতা।

মানুষের সাথে মানুষের এই ধরণের মিলনের সূচনা ক'রে যে বার্ষিক মেলার আয়োজন কবি শান্তিনিকেতনে করেছিলেন, তার মধ্যে মানুষের উপর শোষণ-পীড়ন বা জবরদস্তি আধিপত্য বিস্তারের বুর্জোয়া মানসিকতা যে তাঁর (কবির) ছিল না, তা বলাই বাহুল্য ; বরং ছিল মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর ভালোবাসার সম্পর্ক। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—" ...মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ ; সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো।" [৮৯]

আর মানুষের প্রতি তাঁর এই অগাধ বিশ্বাস ও মমত্ববোধই ছিল বিশ্বভারতীর স্থাপনা ও শান্তিনিকেতনে মিলন-মেলার সূচনার মূল মন্ত্র, সন্দেহ নেই। আসলে, এটা ছিল কবির জীবনাচরণেরই মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রেই তিনি মানুষের কাছাকাছি এসেছেন, বিশ্বমানবতার উদ্গাতা হয়েছেন, বিনিময়ে পেয়েছেন বিশ্ব-জনপ্রিয়তা। ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে বুর্জোয়া মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠলে কবির পক্ষে যে বিশ্বমানবতার প্রচারক হয়ে ওঠা ও বিশ্ব-জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব হত না তা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একজন ব্যক্তি মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুর্জোয়া মানসিকতা পোষণ করতেন না, অথবা মানুষের উপর আত্মম্ভরী আধিপত্য বজায় রাখারও চেষ্টা করতেন না। তদুপরি শোষণ-পীড়নের মাধ্যমে স্বার্থ সাধনের বুর্জোয়া প্রবণতাও কবির ছিল না। বরং তিনি সর্বসাধারণের সাথে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহজ, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেই ভালোবাসতেন। জমিদার হিসাবে তিনি প্রজা-সাধারণের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে স্বার্থপরতায় ভরপুর, বিলাসী জীবন যাপন করেন নি ; অথবা প্রজা-সাধারণকে বিপাকে ফেলার জন্য শোষক সামন্তপ্রভুর হৃদয়হীন ভূমিকাতেও তিনি কখনও

অবতীর্ণ হন নি। বরং তিনি প্রজা-স্বার্থে প্রয়োজন মতো দান-বিতরণ করেছেন, ঋণ মকুফ করেছেন, খাজনা হ্রাস ও মকুফ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি সব রকম প্রজার প্রতি সমান আন্তরিক দৃষ্টি বজায় রেখেছেন, তাদের সবার সাথে মিশেছেন, মিশে তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিয়েছেন, তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন; আর তার মধ্য দিয়েই তিনি অজান্তেই তাদের আপনার জন হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া তিনি যখন জমিদার ছিলেন না, তখনও একজন ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে মানবিকতাবোধ হারিয়ে ফেলেন নি, মনুষ্যত্বকে হননি বিস্মৃত; বরং সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক ও সহৃদয় থেকেছেন তিনি বরাবর। খরা-পীড়িত, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট, বন্যা-বিধ্বস্ত দুঃস্থ-দুর্গত মানুষের জন্য তিনি বারে বারে বিচলিত হয়েছেন। আবার সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের শিকার হতভাগ্য মানুষজনের প্রতিও তিনি সমবেদনায় আকুল হয়েছেন। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারে ব্যথিত হয়েছেন, ক্ষুব্ধও হয়েছেন গভীরভাবে; তাইতো গুরুত্বপূর্ণ উপাধিকে ('নাইট' উপাধি) তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ ক'রে অনায়াসে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ মানুষ, মান ও হুঁশের প্রতীক। এইখানেই তিনি বুর্জোয়া মানসিকতার উর্ধ্বে। এইখানেই তিনি মানব প্রেমিক—মানবতার সেবক—মানবাত্মার আত্মীয়।

১৩ রবীন্দ্রনাথ কি কবি জীবনে বুর্জোয়া মানুষ?

অতএব ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে রবীন্দ্র-চরিত্র (উপরি-উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে) বিশ্লেষণ করলে তাঁকে স্বার্থসর্বস্ব শোষক বুর্জোয়া মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই ধরণের সিদ্ধান্তে আসার পর এবার আমরা আলোচনা করে দেখব একজন কবি হিসাবেই বা তিনি বুর্জোয়া-মানুষ ছিলেন কিনা, অর্থাৎ তিনি বুর্জোয়াকবি ছিলেন কিনা। এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের একান্ত জানা দরকার

যে তিনি তাঁর রচনাতে, বিশেষ করে কবিতা রচনাতে বুর্জোয়া মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন কিনা, অথবা বিলাসী-সুখী-অকর্মণ্য-স্বার্থান্ধ-শোষণকামী জীবনকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কিনা, অথবা স্বার্থপরতা, ন্যায়-নীতি-বিহীনতা, ভণ্ডামী ও তঞ্চকতার জয়গান গেয়েছেন কিনা, সাধারণ মানুষের প্রতি অনীহা ও উপেক্ষা পোষণ করেছেন কিনা, অথবা ব্যথিত-দুর্গত জীবনের বেদনাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন কিনা, অথবা সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত, আলোকিত মানুষদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আন্তরিকতা দেখিয়েছেন কিনা।

আশা করি, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া গেলেই রবীন্দ্রনাথ একজন বুর্জোয়া কবি কিনা—এই মূল প্রশ্নটিরও সমাধান হয়ে যাবে। আর এই উদ্দেশ্যেই তাঁর রচনার (বিশেষতঃ কবিতার) প্রতি নজর দেওয়া এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করি, এবং তাতেই আলোচ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তরের পথে এগোতে পারা যাবে বৈকি।

একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতায় সুস্থ ও সুখী জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পাওয়া যায় নিশ্চিন্ত জীবনের সহজ সুষমা। কিন্তু তাঁর কবিতায় স্বচ্ছন্দ জীবনের অবাধ পদচারণা থাকলেও সাধারণ জন-জীবনের অনিশ্চিত দুশ্চিন্তাময়, বিপন্ন অবস্থার ইঙ্গিত নেই—একথা ঠিক নয়। তাঁর কবিতায় বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ আছে, শোষিতের মর্মবেদনা আছে, মরীয়া হয়ে শোষিত-বঞ্চিতের রুখে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা আছে, আছে ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ তথা শোষণবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতায় সোচ্চার নিন্দাবাদ আছে, আছে শোষণমুখী সমাজের পরিবর্তন সাধন করে সমতাসূচক সুস্থ সমাজ গঠনের জোরালো ইঙ্গিত। কোনো কোনে ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার বক্তব্য জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতেই মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী হয়ে উঠেছে, এবং তা হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক-

ভাবেই। আমরা তার কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তুলে ধরে ধীরে ধীরে আলোচনা করতে চেষ্টা করব—কোথায়, কোন্‌খানে তাঁর কাব্য-চেতনা মার্ক্সবাদী দর্শনের দ্যোতক হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই হয়ে উঠেছে অ-বুর্জোয়াসুলভ।

১৪

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতা একটা অনুপম কল্পনা-বিলাসিতা, একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চের অনুভূতিতে ছেয়ে আছে। আর তাইতো তাঁর কবিতায় নিরাপদ জীবনের অনাবিল উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়, বিলাসী-সুখী জীবনের নিশ্চয়তার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়; অথচ বাস্তব জীবনের কঠোরতার তেমন কোন ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় না, লক্ষ্য করা যায় না বিপন্ন জীবনের বুকফাটা হাহাকার। কারণ, কবির কাছে সে-সময়ে জীবনটা আনন্দের, অস্তিত্বটাই গৌরবের, বেঁচে থাকাটাই মহিমার। তাইতো তিনি পরম উচ্ছ্বাসে বলেছেন—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই।' ('প্রাণ')

এই সময়ের কাব্য-রচনায় কবির হাতে বারে বারেই সুস্থ, সুখী, নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। এই ধরণের জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

"অধরের কানে কানে অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশে দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
...প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে—
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
...দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন ('চুম্বন')

অথবা

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্তকানন মাঝে বসন্ত সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত।
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো। ('গীতোচ্ছ্বাস')

অথবা,

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথমে জীবনপথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন॥
... ...
আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।

অনন্ত বাসর সুখ যেন
নিত্যহাসি প্রকৃতি বধূর—
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখীর অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভাণ অনন্ত মধুর।

সেই গান, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে প্রথম যৌবনে,

ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত-অমৃতময়—
প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে ('পুরুষের উক্তি')

অথবা,

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥
('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ')

কবির এই আনন্দমুখর মানসিকতা, অনাবিল রোমান্টিকতা, সুখী যৌবন চেতনা তাঁর কবিতাকে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ছেয়ে রেখেছে। তিনি লিখেছেন—

অরুণ-রাঙা আজি এ নিশি শেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে
দুগ্ধফেন শয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা ॥
... ...

একটি বাহু বক্ষ 'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি—
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়-কম্পন।
ভূতলে বসি আনত করি শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।...

ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নাম ধাম।
লিখিনু, 'অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম। ('নিদ্রিতা')

অথবা,

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন—
সেই পথ ছায়া ঝরা, সেই বেড়া লতা-ভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন—

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা কত হাসি কত খেলা—
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে॥

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেল ফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা
করিত দক্ষিণ বায়ু অঞ্চল আকুল॥

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহ কাজ করি'—
সুখ দুঃখ ভাগ লয়ে প্রতিদিন যায় বয়ে,
গোপন স্বপন লয়ে কাটে বিভাবরী॥

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র যে কত!
আঁধার হৃদয়তলে   মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

('ব্যক্ত প্রেম')

অথবা,

আঁধারে যেন তুজনে আর তুজন নাহি থাকে।
হৃদয় মাঝে যতটা চাই   ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়—হৃদয় বাকি রাখে॥

...   .

তুদিক হতে তুজনে যেন বাহিয়া খর ধারে
আসিতেছিল দোঁহার প্রাণে   ব্যাকুল গতি, ব্যগ্রপাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল নিশীথ পারাবারে॥

থামিয়া গেল অধীর স্রোত, থামিল কলতান,
মৌন এক মিলনরাশি   তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি—
প্রলয় তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।

('অপেক্ষা')

অথবা

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।...

...   .

আমরা তুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।
আমরা তুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন সলিলে, মিলন-মধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে॥

নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি—
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি ॥

('অনন্ত প্রেম')

অথবা,

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি—
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধু হাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া।

('কেন')

কবির এই নিবিড় রোমান্টিকতা, আকুল-করা স্বপ্নচারিতা ও সুস্থ জীবন-যৌবনের ব্যাকুলতা শুধু তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাতেই নেই, আছে তাঁর পরবর্তীকালের কবিতাতেও। সুস্থ জীবনের উচ্ছ্বাস, কল্পনা-বিলাস ও উচ্ছল জীবনের উজ্জ্বল বিকাশের ইঙ্গিত তাঁর প্রায় সব কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই রয়েছে নিঃশঙ্কচিত্তের সুদুর-প্রসারী পক্ষ-বিস্তার। আসলে, বাস্তব জীবনের রূঢ় কঠোরতা এড়িয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতটি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতায় প্রকট, কারণ তাতেই তৃপ্তি—তা যতই সাময়িক বা ক্ষণিক হোক না কেন। বাস্তবের রূঢ়তার বেড়া টপ্‌কে রোমান্টিকতার পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। দোলাচল ছন্দে নিশ্চিন্ত ও সুস্থ জীবনাচরণের পথে পাড়ি জমাতেই কবির মনে আগ্রহ অধিক। তাইতো পরিণত জীবনেও তিনি উচ্ছ্বাসভরা সুরে গেয়েছেন।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচে রে।

শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ

আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে।
('নববর্ষা')

অথবা,

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরে এই ডানা
মনে মনে।...

সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দেশে
পরীর দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।
('রূপ কথায়')

অথবা,

পাগলা হাওয়ায় বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে।
চেনা শোনার কোন বাইরে
যেখানে পথ নাই নাই রে
সেখানে অ-কারণে যায় ছুটে।
(গীতবিতান, ৪০ নং সংগীত)

অথবা,

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধ সুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে না রে, ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।
(গীতবিতান, ২৪ নং সংগীত)

অথবা,

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার দূরের বাণীর পরশ মানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে।
শস্যক্ষেতের গন্ধখানি, একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্ত গমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মুক্ত কেশে।

(গীতবিতান, ৩১ নং সংগীত)

এ রকমভাবে কবির কবিতায় বাস্তব জীবনবোধ ও তার রূঢ়তার পরিবর্তে প্রায়শঃই এসে হাজির হয়েছে খোলা-মেলা জীবনের মোহল আবেশ আর সেই আবেশের আকুলতা। তাই তাঁর কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লিষ্ট জীবনের পরিবর্তে স্নিগ্ধ জীবনের স্বপ্নালুতার ঘোরে আচ্ছন্ন। ফলে কোমল জীবনবোধ কবির কবিতায় সরাসরি এসে উপস্থিত হয়েছে। কবি লিখেছেন,

কোমল দু' খানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে!
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়,
সেই নিরালায় সেই কোমল আসনে
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়!

('হৃদয়-আসন')

সত্যিই কবির কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই রূঢ় বাস্তব জীবনের পরিবর্তে রোমান্টিক জীবনের পথেই ছুটে বেড়িয়েছে ; ফলে সুখী-নিরাপদ জীবনের মোহময়তা রোমান্সের রূপে কবির কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে ধরা দিয়েছে। কবি লিখেছেন—

রেলগাড়ির কামড়ায় হঠাৎ দেখা
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন ॥

আগে ওকে বার বার দেখেছি
লাল রঙের শাড়িতে—
দালিম-ফুলের মতো রাঙা ;
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলন-চাঁপার মতো চিকন-গৌর মুখখানি ঘিরে।
... ...
হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার।
সমাজ বিধির পথ গেল খুলে
আলাপ করলেম শুরু—।
'কেমন আছ', 'কেমন চলছে সংসার'
ইত্যাদি।

('হঠাৎ দেখা')

অথবা,

নাম তার কমলা
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা—
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।
মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হল না ॥

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিক মেলে না,

প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে—
প্রায় হয় দেখা।...

('ক্যামেলিয়া')

অথবা,

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষে ধুলার দুলাল
পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য—
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।
... ...
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দৃপ্ত।

('পথের বাধন')

১৫

এই রকম রোমান্সধর্মী, সুস্থ ও সুখী জীবনবোধ রবীন্দ্র কবিতার ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃস্থ ও অসুখী জীবন-চিন্তার প্রতিফলন তাই তাঁর কবিতায় অপেক্ষাকৃত কমই ঘটেছে। এর অন্যতম কারণ হল কবির নিজস্ব নিরুদ্বেগ ও নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। স্বচ্ছল ঠাকুর পরিবারের সন্তান হিসাবে কবিকে কখনও আর্থিক দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়নি। সেই সময় ঠাকুর পরিবারটি ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ছিল এক সুপরিচিত পরিবার। কবি এই পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা, বংশগত কৌলিন্য, সু-উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। দুঃস্থ, দরিদ্র, নিরন্ন মানুষের জীবনের কঠোর

বাস্তবতার অভিজ্ঞতা তিনি প্রথম জীবনে ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করতে পারেন নি। বরং নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা তাঁর অভিজ্ঞতার জগতটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই কারণেই তাঁর কবিতায় সুস্থ, সুখী ও সুষমামণ্ডিত জীবনের প্রতিফলন যতটা ঘটেছে, ঠিক ততটা দুঃস্থ ও হতভাগ্য সাধারণ মানুষের ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের প্রতিফলন ঘটেনি।

কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে কবির অভিজ্ঞতার পরিসর ব্যাপকতর হতে থাকে। পারিপার্শ্বিক দুঃখ-কষ্ট, শোষণ-পীড়ন, অন্যায়-অবিচার এবার তাঁর অভিজ্ঞতার দর্পণে প্রতিফলিত হতে লাগল। ফলে নিজেদের সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সুখী পারিবারিক পরিমণ্ডলটির বাইরেও যে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, তা কবি এবার ধীরে ধীরে অনুধাবন করতে লাগলেন। উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে জমিদার হিসাবে এসেই যুবক কবির মনে এই বোধ প্রথম জাগে। প্রজাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন তাঁকে বস্তু জগতের রূঢ়তা সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা তার মনে কঠোর বাস্তবতার ছবি তুলে ধরে। জাতীয় ক্ষেত্রে তখন একদিকে ব্রিটিশের সীমাহীন শোষণ-পীড়ন, অন্যদিকে সেই শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত হওয়ার আকুল প্রয়াস। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উন্মত্ত দাপটে তখন পৃথিবীর সে এক চরম দুঃসহ অবস্থা! বিশ্বযুদ্ধের রূঢ়তাও কবি প্রত্যক্ষ করলেন এবার। শোষিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতাও লাভ করলেন তিনি সফল রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্ভবকেও প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। সাথে সাথে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের অধীন উপনিবেশগুলির সীমাহীন দুর্গতির করুণ দৃশ্যও তিনি দেখলেন। ফলে সব মিলিয়ে রূঢ় বাস্তবের যে নিটোল চিত্র তাঁর মনে মুদ্রিত হল, সেই চিত্রই তাঁকে নিশ্চিত ও নিরাপদ

পারিবারিক জীবনের গণ্ডী থেকে বের করে এনে সমস্যা-শঙ্কুল জটিল বহির্জগতে উপস্থাপিত করে দিল। আর তখন থেকেই বৃহত্তর জগতের জটিল বাস্তবের রূঢ় আঘাতেই কবি চিনতে শিখলেন জীবনকে ; বুঝতে পারলেন যে জীবনটা শুধু রোমান্স নিয়েই নয়, নয় স্বপ্নচারিতা নিয়েও, বরং দুঃখ-কষ্ট, আঘাত-প্রত্যাঘাত নিয়েই। ফলে এবার তাঁর রচনায় সুস্থ-সুখী জীবনের সাথে সাথে দুঃখী ও নিপীড়িত জীবনের ছবিও আঁকা হতে লাগল পরম যত্নের সাথে। প্রকৃতপক্ষে, কবির এতদিনের লালিত জীবনবোধের পরিবর্তনটাই তাঁর চিন্তাধারায় সাধারণ দুঃখ-দীর্ণ মানুষের ছবি মুদ্রিত করে দিল। জীবনবোধের এই পরিবর্তন তথা জীবনের এই নয়া বাস্তব অনুভূতি লাভ সম্পর্কে কবি মৃত্যুর দিন-কয়েক আগে সহজ স্বীকারোক্তি করে গেছেন 'রূপনারায়ণের কূলে' কবিতায় ; সেখানে লিখেছেন—

রূপনারায়ণের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
যে কখনো করেনা বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবনে
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে।

('রূপনারায়ণের কূলে')

জীবনকে সঠিক জানার ব্যাপারে কবির এই যে উদার আত্মস্বীকার, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর জীবনবোধের পট-পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তাইতো সাধারণ জন-জীবন এবার তাঁর রচনার একটা ব্যাপক অংশ দখল করে নেয়। 'সত্যের দারুণ মূল্য' অনুধাবন করার ফলে কবি কঠিনকে ভালোবাসতে শিখলেন। কঠিন বাস্তবের সাধারণ জনগণের কথা তাই তিনি এবার বলতে লাগলেন জোরালো-ভাবে।

একথা ঠিক যে রূঢ় বাস্তবের অভিজ্ঞতা না থাকায় কবি প্রথম জীবনে উচ্ছ্বসিত জীবনের কথা লিখেছেন নিপুণভাবে, কিন্তু পরবর্তী-কালে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষ আর উপেক্ষিত থাকতে পারেনি, বরং একটা উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করে নিয়েছে। সাধারণ মানুষ-জনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশার কথা কবি নিবিড়ভাবে লিখেছেন; তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্নভাবে এঁকেছেন; এবং তা আঁকতে গিয়ে তিনি তাদের দুঃখে আকুল হয়েছেন, আবার তাদের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি যথেষ্ট তৎপরও হয়েছেন। তাইতো সাধারণ মানুষের উপর ধনী মানুষের শোষণ-বঞ্চনার জোরালো বিবরণ তাঁর কবিতায় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় সেই শোষণ-বঞ্চনার প্রতিকারের উপায়ও। তিনি শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শোষিতকে রুখে দাঁড়াবার পরামর্শ দিয়েছেন, বলেছেন সংঘটিত আন্দোলনের কথা, যে আন্দোলনই হল মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর চিন্তা-ধারায় বিপ্লব বা বিদ্রোহ (Revolution)। তাছাড়া কবি পুঁজিবাদকে কখনও স্বীকার করে নিতে পারেন নি। আর সাম্রাজ্য-বাদের প্রতি তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মানুষের উপর মানুষের শোষণপীড়নের ঘোর বিরোধী ছিলেন; অহংকারী, ধন-মদে-মত্ত ধনীর উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল ক্ষুরধার। স্বৈরাচারী ও অন্যায়কারীর উপযুক্ত সাজা হোক, আর

নির্দোষ হোক মুক্ত—এই ন্যায়-দণ্ডনীতির কথা কবির বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে আছে। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শোষক-শাসকের রাষ্ট্রশক্তির বল (force) যতই প্রবল হোক না কেন, সমবেত সাধারণ মানুষের যৌথশক্তি সেই বলের তুলনায় কোন অংশে কম জোরদার নয়। সাধারণ মানুষ সেই যৌথশক্তি দিয়ে তার নিজের ভাগ্য নিজের মতো গড়ে তুলুক, ফিরে পাক জীবনের ন্যায্য অধিকার, দূর করুক তাদের বঞ্চিত জীবনের গ্লানি—এটা কবি আন্তরিকভাবে চাইতেন। আর তা চাইতেন বলেই কবি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি ; বরং তাদের বুকে টেনে নিয়েছেন পিতৃ-সুলভ মমত্ব দিয়ে। এইখানেই রয়েছে কবির রচনায় জন-মুখীনতা তথা অ-বুর্জোয়া সুলভতা। আমরা এবার তাঁর বিভিন্ন কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তুলে ধরে রবীন্দ্র-কবিতার জনচিত্তজয়ী অ-বুর্জোয়প্রবণতার বিষয়ে আলোচনা শুরু করব।

১৬

কবি রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ মানুষই সমাজের মূলভিত্তি। তাদের শ্রমের উপর ভিত্তি করেই সমাজ এগিয়ে চলেছে। সে-তুলনায় সমাজের উঁচু তলার মানুষ অর্থাৎ ধনীরা সমাজকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে তেমন সহায়ক নয়। কারণ তারা কখনও প্রত্যক্ষ উৎপাদন-কাজে অংশগ্রহণ করে না, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি ব্যয় করে, অন্যকে দিয়ে শ্রম করিয়ে, উৎপাদন কাজ (প্রক্রিয়া) চালিয়ে থাকে। কিন্তু যারা নিজেরা শ্রম করে উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করে, তারাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু। তাদের শ্রম বন্ধ হয়ে গেলে উৎপাদন কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সমাজের গতিচক্র হবে গতিরুদ্ধ। সুতরাং ধনী, বিলাসী, সুখী, অকর্মণ্য বুর্জোয়া মানুষ সমাজে সত্যিই অ-কেজো। তাই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি সমাজে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে বলেছেন—

চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

('ঐক্যতান')

ধনী বুর্জোয়া মানুষের পরিবর্তে খেটে-খাওয়া মানুষই যে সমাজের সভ্যতার রথচক্রের গতিকে অব্যাহত রাখার মূল উৎস—এ কথা কবি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। অথচ এই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষই আবার বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী, ধনী-বিলাসী-পরশ্রমজীবী শোষকদের পদানত হয়ে থাকতে হয় এদের। আর পদানত ও অবদমিত থাকতে থাকতে এদের মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায়, পরিণত হয় যন্ত্র-মানুষে; ফলে নিজেদের ন্যায্য অধিকার এরা আদায় করতে পারে না। এদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। সব কিছু অন্যায়-অবিচার এদের নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। কবি এদের—খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের—করুণ জীবনালেখ্য তুলে ধরে বলেছেন—

... ...ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,

দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাস
মরে সে নীরবে।

('এবার ফিরাও মোরে')

কবি অন্তর দিয়ে বোঝেন যে, এইসব খেটে-খাওয়া মানুষ যারা সমাজের পিলসুজ, তারাই ধনীর গর্বান্ধ দমন-পীড়নে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। নিজেদের মুনাফার স্বার্থে স্বার্থসর্বস্ব ধনীরা সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার জোয়ার বইয়ে দিয়ে চলেছে, সমাজে অন্যায়ের বিষবাষ্প ছড়িয়ে চলেছে, ভাল-মন্দ-বোধ নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়ে স্থায়ী অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। সমাজ-জীবন তাই আজ কলুষিত হয়ে উঠেছে, সমাজ হয়ে উঠেছে মানুষের বাসের অযোগ্য। এই কলুষিত সমাজজীবনের ছবি এঁকে কবি বলেছেন—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে,
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

('প্রশ্ন')

কবি বিশ্বাস করেন যে সমাজে যারা হিংসা ছড়াচ্ছে, যারা সমাজকে বিষিয়ে তুলছে এবং যারা ক্ষমতা-মদে-মত্ত হয়ে বিচারের ন্যায়দণ্ডকে প্রহসনে পরিণত করেছে, তারা কখনও ক্ষমা পেতে পারে না। তারা ক্ষমার অযোগ্য। কারণ সমাজকে কলুষিত করার অপরাধ এক ক্ষমাহীন জঘন্য অপরাধ। বিশ্বপিতার কাছে কবির তাই আকুল জিজ্ঞাসা—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো?

('প্রশ্ন')

কবি মনে করেন যে, যে-সব স্বার্থান্ধ মানুষ সাধারণ মানুষকে শোষণ-পীড়ন ক'রে সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, তাদের কখনও ক্ষমা করা যেতে পারে না; কারণ তাহলে আর একটি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আর সেই অন্যায়ের পথ বেয়ে সমাজে আর এক দফা কলুষ বা অন্যায় এসে প্রবেশ করবে। ফলে কুচক্রীর অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে প্রশ্রয়দানকারীও অন্যায়ে জড়িয়ে পড়বে, তখন সে-ও আর এক শাস্তিযোগ্য অপরাধীতে পরিণত হবে। তাইতো কবি বলেছেন,

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে ॥

কবির এই অন্যায়-বিরোধী মানসিকতার জন্যই তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে শোষক-উৎপীড়ক মানুষেরা নিজের স্বার্থের কারণে অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে, তাদের বাড়তি শ্রম করতে বাধ্য করেছে, তাদের মনুষ্যত্বকে বিপন্ন করেছে। আর এই অধীন-শোষিত মানুষেরা তাদের (ধনীদের) শোষণপীড়নের চাপ সহ্য করতে করতে এমন যন্ত্র-মানুষে পরিণত হয়ে পড়েছে যে, তারা শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে। কবির বিশ্বাস, এই সব শোষিত-বঞ্চিত মানুষেরা যদি সৎ-সাহস নিয়ে শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে একবার রুখে দাঁড়ায়, একবার যদি জোরালোভাবে নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দাবি তুলে ধরে, তাহলে শোষক-উৎপীড়কদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; কারণ পরশ্রমজীবী, অকর্মণ্য, বিলাসী শোষকদের শক্তির ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। তাদের বলপ্রয়োগকারী শক্তিতে (coercive-force) কোনো মানসিক দৃঢ়তার ভিত্তি নেই, যেহেতু খেটে-খাওয়া মানুষের শ্রমের উপরেই

তাদের শক্তির ইমারত গড়ে উঠেছে। তাই এই সব শ্রমজীবী মানুষেরা যদি শ্রম করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে ধনী-শোষকদের সেই ইমারত তাসের ঘরের মতো এক নিমেষেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। অথচ তারাই ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের দাপটে সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রেখেছে, তাদের উপর চালাচ্ছে নিজেদের স্বেচ্ছাচার, নিজেদের মুনাফার স্বার্থে বাধ্য করছে তাদের বাড়তি শ্রম করে বাড়তি উৎপাদন করতে। আর বঞ্চিত মানুষ সব হারিয়ে শুধুমাত্র পেটের তাগিদে সেই স্বেচ্ছাচারকে নীরবে সহ্য করে চলেছে। কবি তাই তাদের এই শোষণের চাপে মূহ্যমান ও নির্জীব অবস্থা থেকে জাগ্রত ও উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছেন, তাদের সবাইকে প্রতিবাদে মুখর করে তুলতে চেয়েছেন। তাইতো তিনি তাদের প্রতি বুক-ভরা সহানুভূতির আবেগে বলেছেন—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাশে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার ;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'

('এবার ফিরাও মোরে')

কবি এখানে সাধারণ খেটে-খাওয়া শোষিত মানুষকে অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। আর তাঁর এই আহ্বানের মধ্যেই রয়েছে বিদ্রোহের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

কবির বিশ্বাস, যারা মুনাফার স্বার্থে সমাজে অন্যায় আর উচ্ছৃঙ্খলতা চালাচ্ছে এবং শোষণ-পীড়ন করছে সাধারণ মানুষকে, তাদের সংযত করতে হলে শোষিত-পীড়িতকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে, বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই হবে উচ্ছৃঙ্খল শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে। এর জন্য জীবন যদিবা যায় তো যাক্, দুঃখ নেই। অন্যায় আর অপশাসনের বিরোধিতা করতে গিয়ে যদি মৃত্যুও হয়, সেই মৃত্যু হবে বীরের মৃত্যু, শহীদের আত্মত্যাগ; তাতেই রচিত হবে জীবনের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী ইতিহাস। কবির বিশ্বাস, সবাই মিলে মরণ-পণ প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলতে পারলে শোষণ ও অপ-শাসন দূরীভূত হবেই, জয়ী হবেই মানবতা। তাই বলেছেন—

……দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।

('এবার ফিরাও মোরে')

অন্যায়-অবিচার আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মরণ পণের মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা যে কত ব্যাপক, তা কবি তাঁর 'পূজারিণী' কবিতায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবি এখানে দেখিয়েছেন উচ্ছৃঙ্খল শাসকের খাম-খেয়ালীপনা ও অন্যায় আদেশ লঙ্ঘন ক'রে পূজারিণী বালিকা নিজের জীবন অকাতরে সঁপে দিয়ে ন্যায়ের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছে, জ্বেলেছে সত্যের দীপালোক। আর এর মধ্য দিয়েই বিদ্রোহের যে মূর্ত মানসিকতা ফুটে উঠেছে, তার দীপ্তি অতুলনীয়। ঘটনাটি হল এই যে, মগধের রাজা ধর্মপ্রাণ মহামতি বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধদেবের পদ-নখ-কণা নিয়ে এসে রাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক বৌদ্ধ স্তূপ প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন সেখানে বুদ্ধ-পূজার আয়োজন করেন। পুরনারীগণ সবাই সেই পূজায় অংশ নিয়ে ধন্য হয়। কিন্তু রাজা বিম্বিসারের

পর তাঁর পুত্র স্বৈরাচারী অজাতশত্রু সেই স্তূপে পূজা-অর্চনা করা নিষেধ করে দিলেন, ঘোষণা করলেন—সেই স্তূপে যে পূজা করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। প্রাণভয়ে ভীত হল সবাই এবার। কিন্তু রাজার এই অন্যায় আদেশ শ্রীমতী নামক পূজারিণী বালিকাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারল না। সে এই আদেশ মানতে রাজী নয়। এতদিনকার স্বাধীন ধর্মাচরণের পথে এরূপ অন্যায়ভাবে বিঘ্ন করার প্রয়াসকে সে মোটেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাই সে এই আদেশ লঙ্ঘন ক'রে সন্ধ্যাকালে 'পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া/পুষ্প প্রদীপ থালায় বাহিয়া' সেই 'স্তূপ-পদ-মূলে' নিঃশঙ্ক-চিত্তে পূজা দিতে চলে। অন্য দিনের মতো এদিনও সে সঙ্গে রাজমাতা, রাজবধূ, রাজকন্যাকেও নিতে চায়। কিন্তু তারা সাথে যেতে সাহস পায়না ; তাকে তারা ফিরিয়ে দেয়। রাজমাতা তাকে সভয়ে জানায়—

'এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্য রচনা
শূলের উপর মরিবে সে জনা অথবা নির্বাসনে!'
('পূজারিণী')

রাজবধূ অমিতা সভয়ে সচকিত হয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় তাকে বলে—

'অবোধ, কী সাহস বলে
এনেছিস পূজা! এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে বিষম বিপদ্পাত।'
('পূজারিণী')

রাজকুমারী শুক্লা ব্যাকুল হয়ে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে—

'রাজার আদেশ আজি কে না জানে—
এমন করে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে!'
('পূজারিণী')

কিন্তু কারোর কোন নিষেধই শ্রীমতীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সে এবার সবাইকে ডেকে বলে, 'হে পুরবাসিনী/হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।' কিন্তু তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ-ই তাকে সঙ্গ দিতে এগিয়ে এল না। অবশেষে সে একাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক হিসাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা-কল্পে সেই 'স্তূপ-পদ-মূলে' প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল। আর ঠিক সেই সময় খোলা তরবারি হাতে পুর-রক্ষক এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,/মরিবার তরে করিস আরতি?' পূজারিণী স্নিগ্ধ-সুরে বলল, 'শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী'। পুররক্ষক তখন কালবিলম্ব না করে তার শিরচ্ছেদ করল। আর তখন—

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্ত লিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা—

('পূজারিণী')

নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে পূজারিণী শ্রীমতী অন্যায় আর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়-বিদ্রোহের যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরল তা সর্বসাধারণের কাছে অনুসরণীয় হয়ে রইল। যদিও এই বিদ্রোহ বা বিরোধিতায় শ্রীমতীর জীবনাবসান ঘটল, তবু সে লাভ করল মৃত্যুঞ্জয়ী অমরতা, যা শাসক-শোষকের ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতা বা প্রভাব-প্রতিপত্তির চেয়েও অনেক অনেক গৌরবের। কবি তাই এই কবিতার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের মানসিকতাই জন-মানসে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই কবিতায় কবির প্রচারিত এই বিদ্রোহের চেতনা মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর বিপ্লবের ধারণার সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই।

অন্যায়-শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানসিকতা-সম্পন্ন কবির আর একটি কবিতা হল 'বন্দীবীর'। এই কবিতায় দেখানো

হয়েছে যে পাঞ্জাবের নির্ভীক শিখদের বিরুদ্ধে দিল্লীর বাদসাজাদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ; উদ্দেশ্য হল বীর-সাহসী শিখদের যুদ্ধে পরাজিত করে দমিয়ে রাখতে পারলে সহজেই দীর্ঘকাল সরকারী ক্ষমতা তথা শাসনাধিকার নিঃশঙ্কভাবে ভোগ-দখল করা যাবে। তাই শুরু হল যুদ্ধ পঞ্চনদীর তীরে। তুমুল যুদ্ধ। ব্যাপক সংখ্যক মোগলবাহিনীর কাছে শিখেরা পরাস্ত হল ; তারপর তাদের বন্দী ক'রে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। শিখদের জীবন-দীপ নির্বাপনের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হল যে, শোষকের শক্তি শুধুমাত্র বাহুবলেই ; আরও প্রমাণিত হল যে শিখেরা জীবন দিয়েই বিদ্রোহের যে দীপ জ্বালিয়ে গেল, তা অনির্বাণ। কবি দেখিয়েছেন, শিখদের দমন করার জন্য পঞ্চনদীর তীরে দিল্লীর বাদশা রাতের আঁধারে অসংখ্য (মোগল) সৈন্য প্রেরণ করছেন। শুরু হল ভয়ানক যুদ্ধ। 'গুরুজীর জয়' ধ্বনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিখেরা—

মোগল-শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—
দংশনক্ষত শ্যেন-বিহঙ্গ যুঝে ভূজঙ্গ সনে।

('বন্দীবীর')

কিন্তু পর্যাপ্ত রাজশক্তির কাছে শিখেরা পরাস্ত হল, বন্দী হল তাদের নেতা বন্দা ; বন্দী হল সাতশো (৭০০) শিখ। সাতদিন ধরে তাদের হত্যা করা হল একের পর এক। 'গুরুজীর জয়' ধ্বনি দিতে দিতে তারা ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ করল। অবশেষে শিখনেতা বন্দার এক কিশোর পুত্রকে তার নিজের কোলে ফেলে দিয়ে বাদশার কাজী তাকে বললেন, 'ইহারে বধিতে হইবে—নিজ হাতে অবহেলে'। বন্দা তখন ক্ষণকাল বিচলিত হয়ে পড়ল। অবশ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কর্তব্য মনে মনে স্থির করে নিল,

তারপর

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকাল তরে মাথার উপরে রাখে দক্ষিণ পাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার রাঙা উষ্ণীষখানি।
তার পরে ধীরে কটিবাস হতে ছুরিকা খসায়ে আনি
বালকের মুখ চাহি
'গুরুজীর জয়' কানে কানে কয়, 'রে পুত্র, ভয় নাহি'

('বন্দীবীর')

আর সেই মুহূর্তে—

নবীন বদনে অভয় কিরণ জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল, বালক উঠিল গাহি
'গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়,'বন্দার মুখ চাহি॥

('বন্দীবীর')

অন্যায় আর অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল তখন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে—

বন্দা তখন বাম বাহুপাশ জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে ছুরী বসাইল বলে—
'গুরুজীর জয়' কহিয়া বালক লুটালো ধরণীতলে॥

(বন্দীবীর')

আর অকুতোভয় কিশোরের রক্তপাতের উলঙ্গ বিভীষিকায় তখন—

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি' একটি কাতর শব্দ
দর্শক জন মুদিল নয়ন, সভা হল নিস্তব্ধ।

('বন্দীবীর')

অন্যায়-অবিচার আর দুঃশাসনকে রুখতে গিয়ে মৃত্যু যে কত মহৎ, কত পবিত্র হয়ে ওঠে এই 'বন্দীবীর' কবিতার ছত্রে ছত্রে কবি তা তুলে

ধরেছেন। এই কবিতাতে কবির মূল বক্তব্যই হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ্ গড়ে তুলতে হবে, চালিয়ে যেতে হবে আপোষ-হীন সংগ্রাম। আর বলাই বাহুল্য এই বক্তব্য বা বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দর্শনের একান্ত অনুগামী হয়ে উঠেছে। যদিও এই কবিতায় অপশাসন রুখতে গিয়ে সাহসী শিখদের মৃত্যুবরণ করতে হল, তবু ন্যায় ও অন্যায়ের সংগ্রামে তাদের জয় ঘটেছে নিশ্চিত, আর এই জয় মানসিক জয়—মনের দৃঢ়তার জয়। পক্ষান্তরে শক্তিমান মোগলের আনুষ্ঠানিকভাবে দৈহিক জয় ঘটিলেও তাদের মানসিক পরাজয় ঘটেছে চূড়ান্তভাবে, মনের শক্তির ঘটেছে সম্পূর্ণ বিপর্যয়। আর তাইতো লজ্জায়, দুঃখে, শোকে মোগলেরাই বেশী মুহ্যমান; তাইতো তথাকার মোগল-"দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হল নিস্তব্ধ।" —এই বাক্যের মধ্যেই তো মোগলের নিশ্চিত পরাজয়ের নিটোল ছবি ফুটে উঠেছে। মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রদর্শনের সেই মূল সুরটি তাই এখানেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে শোষক যতই বলশালী হোক না কেন, সমবেত বিদ্রোহের মুখে তার বল বা শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ, তাই তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; তার নিজের সংঘটিত শোষণেই তার সেই পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

তাইতো কবির বিশ্বাস শোষিত, রিক্ত, নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। তারাই সমবেত প্রয়াস তথা সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধনী-শোষকের সংঘটিত অন্যায়কে প্রতিহত ক'রে নিজেদের বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করতে পারে। তাই তাদের সংগঠিত হতে হবে,- হতে হবে সমবেত, শোষণের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ। আর তা যদি তারা হতে পারে, তাহলে তাদের দুঃখ কিসে, কিসেই বা ভয়! কবি বলেছেন—

কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস;
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,

গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস ?
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

('হতভাগ্যের গান')

এখানে কবির বক্তব্য হল এই যে, নিঃস্ব-রিক্ত-সর্বহারা মানুষ কারো ক্রীতদাস নয়, এমন কি ভাগ্যদেবীরও নয়। তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবে নিজেদের ভাগ্যকে, মুক্ত হবে তারা শোষণ-পীড়ন আর বঞ্চনার জোয়াল থেকে। তাইতো তারাই হতে পারবে বিশ্বে 'সর্বজয়ী', হতে পারবে শৃঙ্খলমুক্ত ও স্বাধীন। আর এই স্বাধীনতাই তাদের জীবনে এনে দেবে বাঁচার এক নতুন আস্বাদ, খুলে দেবে জীবনের এক নতুন দিগন্ত। সেই নতুন জীবনের আগ্রহেই তাদের সমবেত প্রচেষ্টা বা সংগঠিত আন্দোলনের পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই তারা বিশ্ব-সংসারে নিজেদের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কবির এই বিশ্বাস মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর সেই সিদ্ধান্তের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে উঠেছে যে

> সর্বহারাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার মতো কিছু নেই।
> (বরং) জয় করার মতো তাদের আছে বিশ্বখানি।
> (তাই) দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এক হও।
> ["The Proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite !"][৯০]

অনুরূপভাবে কবিও বলেছেন—শোষণ-পীড়নের চাপের কাছে মুখ বুজে পড়ে থাকলে চলবে না, ভাগ্য জয়ের সংগ্রামে সর্বহারাদের সমবেত-ভাবে জীবনের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেমে পড়তে

হবে। আকাশের মতো বিশাল শোষণের বোঝার বুক ভেদ করে তাদের ছিনিয়ে আনতে হবে বিজয়-সূর্য, তাদের বলতে হবে—

> আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
> আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
> ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
> ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ
> হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥
>
> ('হতভাগ্যের গান')

হ্যাঁ, কবির বিশ্বাস এইভাবেই সর্বহারা মানুষ নিজের ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে পারে, পারে তার ভাগ্যকে ফিরিয়ে নিতে। তাইতো কবি 'কালান্তর' পর্যায়ের রচনায় 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ……একদিন অপরাজিত মানুষ—নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে; মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।[৭১]

আর এই কারণেই কবি মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর মতোই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শোষণ-বঞ্চনার প্রতিকার হতে পারে, অন্যথায় নয়—নয় ভীরু কাপুরুষতায়। তাই তাঁর মতে, উৎপীড়িতের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল বিদ্রোহ। বিদ্রোহের দাবানলেই সে শোষণ-পীড়নের সৌধ পুড়িয়ে ছার খার করে দিতে পারে। কবির প্রচারিত এই বিদ্রোহের ধারণাই যে মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর বহুল প্রচলিত বিপ্লব (Revolution) বা শ্রেণী-সংগ্রামের (class-struggle) ধারণার প্রতিরূপ তা বলাই বাহুল্য। যদিও কবি তাঁর কবিতায় 'বিপ্লব' এই বিশেষ শব্দটি খুব

জোরালোভাবে ব্যবহার করেন নি, অথবা ব্যবহার করেন নি 'শ্রেণী সংগ্রাম' কথাটিও। তবু তিনি তাঁর রচনায়, বিশেষতঃ কবিতায়, শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের অস্ত্র হিসাবে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের বিদ্রোহের যে ছবি এঁকেছেন তা মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর প্রচারিত বিপ্লবেরই নামান্তর। একটু বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৭

মার্ক্স ও এঙ্গেলস 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' গ্রন্থে (The Communist Manifesto) মানবসমাজের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বিদ্রোহ বা বিপ্লবই হল শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির হাতিয়ার। তাঁরা দেখিয়েছেন যে দাসযুগে দাসমালিকদের সীমাহীন দমন-পীড়নে অসহ্য হয়ে দাসেরা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে দাসযুগের অবসান ঘটায় এবং আনে উন্নত সামন্তযুগ। সেযুগে সামন্তপ্রভুদের কৃষিভিত্তিক শোষণের বিরুদ্ধে সামন্তপ্রজারা কৃষি-বিদ্রোহ করে। আসে উন্নততর পুঁজিবাদী যুগ। এই যুগে পুঁজিপতিদের শোষণ-পীড়নের চরম শিকার সর্বহারা শ্রমিকরা তাই বিপ্লব ক'রে পুঁজিপতিদের পরাস্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলেই তাঁরা বিশ্বাস করেন। সুতরাং মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ মনে করেন যে শোষণ ও অপশাসনকে দূর করতে হলে চাই বিদ্রোহ বা বিপ্লব, চাই শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সার্বিক সংগ্রাম। কারণ এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবসমাজের উন্নততর ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটেছে। বিপ্লব বা শ্রেণী-সংগ্রামই তাই যুগের পর যুগ ধরে শোষিত সর্বহারার বাঁচার প্রেরণা হয়ে উঠেছে বলেই

তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাইতো তাঁরা শোষণ-বঞ্চনার প্রতিকারের অস্ত্র হিসাবে বিপ্লবের জয়গান গেয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

অদ্যাবধি বিদ্যমান সমস্ত সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

("The history of all hitherto, existing society is the history of class struggles.")[৯২]

(The Communist Manifesto)

বিপ্লব সম্পর্কিত মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর এই বিশ্বাস কবি রবীন্দ্রনাথের মনেও গভীরভাবে ছিল। কবিও বিশ্বাস করতেন যে শোষণ বঞ্চনার প্রতিকার বিদ্রোহ বা রুখে দাঁড়াবার মধ্য দিয়েই পাওয়া যেতে পারে। তাই যেখানে অন্যায়, অবিচার আর অপশাসন, সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই হবে; এবং একমাত্র তাহলেই সেই অন্যায়-অপশাসন দূরীভূত হবে, নইলে নয়।

প্রসঙ্গক্রমে একথা অবশ্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে কবি বিদ্রোহ বা বিপ্লবকে মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর মতো ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর চিরন্তন দ্বন্দ্ব অবসানের হাতিয়ার হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের অস্ত্র হিসাবেই। তাই মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ যখন বলেন যে যুগের পর যুগ ধরে সম্পত্তিহীন শ্রেণীবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সম্পত্তিবান শ্রেণীর শোষণকে প্রতিহত করছে, তখন কবি কিন্তু মনে করেন যে শুধু শ্রেণী-শোষণ নয়, যে-কোন শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচারকে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই দমন করা যায়। অর্থাৎ মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর মতো কবি শ্রেণীগত চিন্তা-চেতনার দর্পণে বিপ্লব বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়াসকে দেখেন নি, দেখেছেন সার্বিক অন্যায় অবিচারকে প্রতিরোধ করার হাতিয়ার হিসাবে। তাই অন্যায় ও অপশাসনকে বৈপ্লবিক প্রতিরোধ বা রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাদের নির্মূল করে মনুষ্যত্বের মহৎ মহিমা প্রতিষ্ঠার বাণী

কবি আজীবন ধরে প্রচার করেছেন। কবির এই চিন্তাধারাই তো মার্ক্স-এঙ্গেলস্ প্রচারিত বিপ্লব বা বৈপ্লবিক মানসিকতা। আর সেই মানসিকতার সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি 'গীতালী'র ছত্রে ছত্রে; বলেছেন—

বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই ? মরতে হবে।
লুঠ-করা ধন করে জড়
কে হতে চাস সবার বড়
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে;
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে। (গীতালী)

অর্থাৎ মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনাচরণে কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে মানুষের সংগঠিত সংগ্রাম শুরু হবেই; সেই সংগ্রামে অন্যায়-বাধা আরোপকারীর পতন ঘটবে এবং মানুষ তার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। এটাই তো মার্ক্সবাদী বিপ্লব, এটাই তো সেই বিপ্লবের মর্মকথা। কবির বিভিন্ন রচনায় এই বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার ব্যাপক অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবির রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের অস্ত্র হিসাবে বিপ্লবকে দেখার মার্ক্সবাদী প্রবণতাটি যে কবির চেতনাতেও গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল, তা এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যেতে পারে।

এদিক থেকে আমরা প্রথমে কবির 'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থের 'সুধিয়া' ও 'মাধো' নামক কবিতা দুটির উল্লেখ করতে পারি।[৯৩] এই কবিতা দুটিতে উৎপীড়িত, রিক্ত-নিঃস্ব মানুষের বিদ্রোহের যে মূর্ত ছবি আঁকা হয়েছে তা মার্ক্সীয় সর্বহারা বিপ্লবের (Proletarian Revolution) ধারণার সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। কবিতা দুটির বিশ্লেষণ তাই এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরী বলেই মনে করি। প্রথমে আসি 'সুধিয়ার' কথাতেই।

'সুখিয়া' কবিতাতে সামন্তযুগীয় শাসন-শোষণের নির্লজ্জ রূপটি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সাথে সাথে আরো গুরুত্বের সঙ্গে যে বিষয়টি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা হ'ল সেই শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের মনে বিদ্রোহের দৃঢ় অঙ্গীকার। সুখিয়া একটা গরুর নাম। তার মালিক হল শিউনন্দন। কিন্তু তাকে দেখা-শোনা ও লালন-পালন করে শিউনন্দনের পুত্র সামরু। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী এখন। তারা ধার-দেনায় জর্জরিত। সংসার চালানো দায়। তাই 'ভগবান' 'ভগবান' বলে চিৎকার করে অথবা কাঁদা-কাটি করে দারিদ্র্য দূর করা যে সম্ভব নয় সে-কথা দৃঢ়চেতা যুবক সামরু বেশ ভালো করেই বোঝে। আর এর সাথে তাদের উপর ধনী-মানুষের জোর-জুলুম ও অন্যায়-অবিচার চলছে। ফলে তার মনে ক্ষোভ; আর সেই ক্ষোভ থেকে বিদ্রোহ। এমনই বিদ্রোহী মনের প্রতীক সামরু একদিন বন্যার পরে সারাদিন বন্যায় ভেসে-যাওয়া সমস্ত পাড়াটা মন্থন করে অশেষ কষ্টে অবশেষে তিনটে গরু নিয়ে বাড়ী ফিরে দেখে—

…দুহাত চোখে চাপা দিয়ে
ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে নড়ছে বাপের মুখ—

('সুখিয়া')
রবীন্দ্র রচনাবলী,
তৃতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৫১৬

দারিদ্র্য-দুঃখ আর শোষণের বিভীষিকার মধ্যেও অসহায়ের মতো বাবা শিউনন্দনকে ঈশ্বরের নাম জপ করতে দেখে সামরু অসহ্য হয়ে ওঠে ; সে বোঝে—হাজার ইষ্টনাম জপ করলেও ঈশ্বর এসে তাদের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে যাবে না ; এর জন্য তাদের নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে। এই কারণে বাবা যখন অবোধের মতো ইষ্টনাম স্মরণ করছে, তখন—

তাই দেখে ওর একেবারে জ্বলে উঠল বুক ;
বলে উঠল, "দেবতাকে তোরা কেন মরিস ডাকি।

তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুকু আজো রইল বাকি
ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ঘটুকনাকো যাই আর,
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।"
('সুধিয়া')

সামরু বাস্তবজগতের জটিলতা জানে ও বোঝে। তাই সে নিজের পায়েই দাঁড়াতে চায়। নিজের শ্রম-শক্তিকে মূলধন করে সে দুস্তর সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু পথে তার আর এক বাধা। দেনার দায়। তাই ঘটি-বাটি বেচতে হচ্ছে ধীরে ধীরে। দুশ্চিন্তায় পড়েছে সামরু এবার। কারণ—

এদিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে,
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে;
('সুধিয়া')

এমন সময় একদিন মাল ক্রোক করতে এল ধনী দুনিচাঁদ বেনে। সাথে এল তার ছোট ছেলে। ছেলেটি দাবি করল সুধিয়াকে (সামরুর গরুটিকে) তাকে দিতেই হবে। সামরু এই অন্যায় আবদারে রেগে লাল হয়ে উঠল; রুখে দাঁড়াল সে মারমুখী হয়ে। তখন সেদিনের মতো চলে গেলেও—

শেঠজী বলে মাথা নেড়ে, দুই চারি মাস যেতেই
ঐ সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই। ('সুধিয়া')

সত্যি সত্যিই একদিন দুনিয়াচাঁদ শেঠজী সামরুর অনুপস্থিতিতে তার বাড়ী থেকে সুধিয়াকে নিয়ে গেল এবং নিজের গোয়ালে নিয়ে রাখল। সুধিয়া-অন্ত প্রাণ সামরু বাড়ী ফিরে সুধিয়াকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। রাগে-দুঃখে-শোকে সে ক্ষ্যাপাটে হয়ে উঠল। ' "খোলা ভোজালি হাতে" নিয়ে সে মোকাবিলা করতে গেল শেঠজীর সঙ্গে। শেঠজীদের রচা আইনে সে কিছু করলেই হবে অপরাধী। কিন্তু মানবতাবোধ একটি জায়গায় এসে সকল আইন

ছাপিয়ে ওঠে। সে হল বিপ্লবের মুহূর্ত।'[২৪] হ্যাঁ, সত্যিই সামরু এবার বিপ্লব করতে চায়, বিদ্রোহ করতে চায় শেঠজীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তাই সে শেঠজীকে শাসিয়ে বলে—'সুধিয়া যদি তোমার গোয়াল থেকে আসতে না চায়, তবে ও তোমার কাছেই থাকবে; কিন্তু ও যদি তোমার গোয়াল থেকে চলে আসতে চায়, তবে ওকে জোর করে ধরে রাখলে ভীষণ বিপদ হবে, জেনো।' শেঠজী অবশ্য বেশ ভালো করেই জানে যে, সামরুর আদরের সুধিয়া সামরুর সাথে চলে আসবেই। তাই সে সামরুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। সামরু কিন্তু বেপরোয়া। পুলিশ-টুলিশে সে মোটেই ভয় পায় না; সে তার সুধিয়াকে নিয়ে যাবেই, তাতে যা হয় হোক। সে তাই পুলিশ ডাকার হুমকির প্রত্যুত্তরে শেঠজীকে শেষবারের মতো বলে গেল—

......ডেকো;
ফাঁসি আমি ভয় করিনে এইটি মনে রেখো।
দশ বছরের জেল খাটব ফিরব তো তারপর,
সেই কথাটা ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।

('সুধিয়া')

মরীয়া মানুষের এই যে রুখে দাঁড়াবার চরম প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাই হল বিপ্লব। আর সামরু সেই বিপ্লবের সূচনা করে দিল মাত্র এবং সে জয়ী হল। সে তুনিচাঁদের শোষণের কাছে মাথা নত না করে সুধিয়াকে নিয়ে ঘরে ফেরে এবং প্রমাণ করে দেয় যে অন্যায় ও অপশাসনের কোনও নৈতিক শক্তি থাকে না, তাই তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফলে শোষিতের রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শোষণ-পীড়নের অবসানের ইঙ্গিত। আর এই ইঙ্গিতটিই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন 'সুধিয়া' কবিতায়। তিনি অন্যায় ও শোষণকে প্রতিহত করার ব্যাপারে সামরুর যে দৃঢ় মানসিকতার ছবি এঁকেছেন, সেই ছবির মধ্য দিয়েই তিনি মার্ক্সীয়

সর্বহারা বিপ্লবের ধারণাকে আর একবার সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।

বিপ্লবের চিন্তা-চেতনার তত্ত্বপ্রচারকারী কবির এইরকম আর একটি কবিতা হল 'মাধো'। মাধো কবিতায় শুধু বিদ্রোহ আর বিপ্লবের বাণীই প্রচার করা হয়নি, সাথে সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন দৃঢ় মনোবৃত্তির সুষ্ঠু পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে; তাতে যে বিপদ আসে, তাতেও কোন পরোয়া নেই। এই কবিতায় কবি আর একটি চরম প্রগতিমূলক বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তা হল শ্রমিক সংগঠন বা Trade Union-এর গঠন-সংক্রান্ত চিন্তাধারা। শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমিকদের হয়ে কাজ করার যে শ্রমিকসংগঠনমূলক প্রবণতা, তার ইঙ্গিত এই কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে নির্ভেজাল সংগ্রামী মানসিকতার দৃঢ়তায় ভরপূর এই 'মাধো' কবিতাটি মার্ক্সীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ প্রতীক হয়ে উঠেছে এবং তা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজভাবেই, এবং তাই তা যথার্থ হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই।

মাধো বিপ্লবী-মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ একটি চরিত্র। তার বাবার নাম জগন্নাথ। পেশায় সে স্যাকরা। রায়বাহাদুর কিষণলালের পারিবারিক স্যাকরার কাজ করে সে। বাবার স্যাকরাগিরিতে আগ্রহ নেই মাধোর। এর চেয়ে বরং পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানোতেই তার অধিক আগ্রহ। পাড়ার কুকুর, বেড়াল, কাঠবেড়ালি, শালিক-পাখী প্রভৃতি পশু-পাখীর সাথে তাই তার নিবিড় আন্তরিকতা, যেন এরা তারই নিজের পশুপাখী। একদিন রায়বাহাদুর কিষণলালের ছেলে দুলাল তার (মাধোর) কুকুর বটুকে চাবুক দিয়ে মারতে এল। এতেই বাধল মহাগোল। মাধো রোষে ফেটে পড়ল, দিল তাই দুলালের চাবুক ভেঙে। দুলাল বাবার কাছে নালিশ করল, মাধোকে বেঁধে রাখল উচিত শিক্ষা দেবে বলে। কিন্তু মুক্তি দিতে এগিয়ে এলেন দুলালের যুক্তিপরায়ণা মা; তিনি নিজের ছেলের অন্যায়টি

বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাছাড়া স্বামীর দুষ্কর্মের জন্য তিনি তাকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তার দয়ায় মাধো মুক্তি পেলেও কিষণলাল বা দুলালের ঔদ্ধত্য ও অন্যায়-অবিচারকে তার বিপ্লবী মন কোন মতেই মেনে নিতে পারছিল না; এবং একেবারেই প্রায় সঙ্গীহীন, শক্তিহীন বলে তাদের উদ্ধত শক্তির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধও সে গড়ে তুলতে পারছিল না। তাই সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। আসে বাংলাদেশে। তারপর সময়মতো চটকলে কাজ নেয়। রোজগার করতে সক্ষম হওয়ার পর সে এবার বিয়ে করে সংসারী হল। আর সহজাত অন্যায়-বিরোধী মানসিকতা ও ন্যায়-প্রবণতা দিয়ে সে চটকলে ধীরে ধীরে শ্রমিক-নেতা হয়ে ওঠে। চট-কলের কর্তৃপক্ষের শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী (অর্থাৎ পাটের দাম কমে যেতেই মালিক শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে দেয়) ও মালিকের নিজের স্বার্থানুকূল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তার নেতৃত্বে এবার শ্রমিক-ধর্মঘট শুরু হয়। আর এই ধর্মঘট শুরু করার ব্যাপারটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে শ্রমিক সংগঠন বা Trade Union গঠনের মূল উৎসটি; কারণ শ্রমিকদের সংগঠিত ক'রে তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করতে না পারলে কখনও শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা ও তাকে সফল করা যেতে পারে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে কর্তৃপক্ষের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় হিসাবে কবি ধর্মঘটের অধিকারকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর এই 'মাধো' কবিতায়। যাই হোক, মাধোই যে চটকলের এই ধর্মঘটের হোতা ও শ্রমিকদের সংগঠিত করার নেতা—সে-কথা বুঝতে পেরে কর্তৃপক্ষ মাধোকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ-উপরোধ করল, কারণ নেতা হিসাবে মাধো কাজে যোগ দিলেই অন্য ধর্মঘটী শ্রমিকেরাও তার সাথে সাথে কাজে যোগ দেবে—এই ভরসায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মাধো ভুলবার পাত্র নয়, কারণ সে নিজের স্বার্থের সাথে শ্রমিকদের স্বার্থের কথাও চিন্তা করে। তাই কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যর্থ হল। সহকর্মী শ্রমিকদের

স্বার্থ উপেক্ষা করে সে কিছুতেই বেইমান—ও স্বার্থপরের মতো কাজে যোগ দেবে না, এর জন্য জানও কবুল ! তাই মালিক যখন বলল—

"মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক।
দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষে মরবি যে মার খেয়ে।"

রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড—'মাধো'

মাধো বেইমানি করতে চায় না ; সে নির্ভীকভাবে মালিককে শুনিয়ে দেয়—

"মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"

—'মাধো'

মাধোকে শ্রমিকদের স্বার্থে এতটা দৃঢ় থাকতে দেখে মালিকপক্ষ আর কোন উপায় না পেয়ে পুলিশ ডেকে ধর্মঘট ভাঙতে শুরু করল। পুলিশের হস্তক্ষেপে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হলে মাধো যারপরনাই ক্ষুব্ধ হল। তার কাছে এ ঘটনা নিষ্ঠুর ও অমানবিক বলেই মনে হল। তাই মালিকের জুলুম ও পুলিশী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে—

মাধো বলল, "সাহেব আমি বিদায় নিলেম কাজে ;
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।" ('মাধো')

মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ, সহকর্মীদের স্বার্থ-চেতনায় আন্তরিক ও সর্বোপরি শোষণ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনের যুবক মাধো আবার দারিদ্র্য-তাড়িত জীবনে হাসিমুখে ফিরে গেল। অথচ সে ধর্মঘট থেকে গা বাঁচিয়ে কাজে যোগ দিলে মালিকের স্নেহধন্য হয়ে কী মহাসুখেই না দিন কাটাতে পারত! কিন্তু বিপ্লবী মনের উদার মানুষ মাধো মালিকের অন্যায়-অবিচার সয়ে নিয়ে নপুংসক, তোষামোদী, স্বার্থান্ধ জীবন যাপন করতে একেবারেই নারাজ। তাই সে বেছে নিল দুঃখীর জীবন, বেইমানীর নয় ; মেহনতের জীবন

চাটুকারের নয় ; সততার জীবন, হীন চেতনার জীবন নয়। খাঁটি বিপ্লবীর মতো নিঃস্ব-রিক্ত-সর্বহারা মাধো এবার পথে বেড়িয়ে পড়ল ; তারপর—

চলল সেথায় যে দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে—
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি—
ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরানো তার মাটি।

('মাধো')

না পাক মাটি, ক্ষতি নেই। তবু মাধো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মন নিয়ে পথে পথে ঘুরুক। কবির বিশ্বাস, একদিন-না-একদিন সে বিপ্লবের চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেই। সেদিন বিপ্লব না ঘটেই পারে না। আর সেদিনই হবে সেই উদারমনা নিঃস্বার্থ বিপ্লবীর সযত্নে লালিত সহজাত অন্যায়-বিরোধী আদর্শের যথার্থ সার্থকতা। কবি তাই এই 'মাধো' কবিতায় একটি খাঁটি বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন মাধোর সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়েই। তাই মাধোর চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কবি যে শোষণ-বিরোধী ও জনস্বার্থমুখী আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছেন তা নিঃসন্দেহে মার্ক্সীয় সাম্যবাদী রাষ্ট্র-দর্শনের একান্ত অনুগামী। কবির রচনায় মাধো অন্য সকলের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এক প্রকৃত সাম্যবাদী পুরুষ ; শ্রমিকদের স্বার্থে ও ন্যায়-আদর্শের অনুকূলে চাকরি ছেড়ে দুঃস্থ জীবন সে বরণ করে নিতে জানে, তবু কিন্তু স্বার্থপর হয়ে ওঠে না, কুচক্রী মালিকের নিছক-তাঁবেদারে পরিণত হয়ে অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের অন্যায়ের সাথে আপোষহীন মানসিকতা ও মার্ক্সীয় বিপ্লবী মানসিকতার নিবিড় একাত্মতা, সন্দেহ নেই। তাইতো কবির মাধো শোষণ, অপশাসন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কারণ "মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে" কবি মনের দিক থেকে কখনও স্বীকার করে নিতে

পারেননি। আর পারেননি বলেই বিদ্রোহ বা বৈপ্লবিক প্রতিবাদের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে জনৈক লেখক পরম আস্থার সাথে লিখেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবে আস্থাশীল ছিলেন—যে বিপ্লব অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে মানবমুক্তি ও কল্যাণ-প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। মুক্তি দেশের মানুষের জন্য এবং সেই মুক্তির আদর্শ বিশ্বমানবের জন্য।[৯৪ক]

অন্যায় আর অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদমূলক কবির অপর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'বিচারক'।[৯৫] এই কবিতায় কবি বিচারকের ন্যায়ানুগামিতা ও অন্যায়-বিরোধিতার আদর্শ কর্তব্যটিকে তুলে ধরেছেন। এখানে ন্যায়ানুগামী বিচারকের অন্যায়-বিরোধী দৃঢ় মানসিকতার মধ্য দিয়ে তিনি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং তার মধ্যে দিয়েই তিনি উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বিনীত শাসকের বিরুদ্ধে সকলের ক্ষোভের দাবানল জ্বালিয়ে তুলেছেন। যদিও এখানে অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন মানসিকতাসম্পন্ন বিচারককে বিপ্লবী মাধোর মতো সব কিছু হারাতে হল, তবু সর্বহারার ন্যায়চারিতা ও অপশাসনের বিরুদ্ধে তার (সার্থক) বিদ্রোহ করার প্রবণতার অনাবিল আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি কবি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিচারক কবিতায়। ফলে এখানেও কবি মার্ক্সীয় বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে সফল হয়েছেন পুরোমাত্রায়।

এই ('বিচারক') কবিতায় ন্যায়ানুগামী বিচারক হলেন রাম শাস্ত্রী মহাশয়। ন্যায়দণ্ডের ভার ন্যস্ত তার উপর। কিন্তু পাপাচারী রঘুনাথ রাও নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করে এবং এই দুষ্কর্ম চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে মহীশূরের অধিপতি হায়দার আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। কিন্তু পথে বিচারক রাম শাস্ত্রীজী তাকে বাধা দিয়ে বলেন যে, সে (রঘুনাথ) হত্যার দায়ে

অপরাধী ; আর কয়েদী অপরাধীর রাজ-বেশে যুদ্ধযাত্রা বিধিসম্মত নয়। তিনি তাই বলেন—

বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্র।
বিচার তাহার না হয় যত দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
ন্যায়ের বিধান সূত্রে। ('বিচারক')

শাস্ত্রীজীর মুখে ন্যায়-বিচারের রায় শুনে দুর্বিনীত, উচ্ছৃঙ্খল রঘুনাথ রাও উদ্ধতভাবে বলে ওঠে—

নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসিনি পথ মাঝখানে
ন্যায় বিধানের ভাষ্য। ('বিচারক')

উদ্ধত, স্বৈরাচারী, দুর্বিনীত এই শাসকের অধীনে কাজ করাটা ন্যায়াদর্শের ঘোর বিরোধী বলে মনে করলেন শাস্ত্রীজী ; তিনি তখন দুরাচারী রঘুনাথের চরম অপকর্মের বিরুদ্ধে (মাধোর মতো) চাকরি ছেড়ে বিদ্রোহ ক'রে বললেন—

……রঘুনাথ যাও,
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ। (বিচারক)

ন্যায়-বিচারের স্বার্থে ও অপশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার

বলিষ্ঠ আবেগে বিচারক শাস্ত্রীজী অবিচল আস্থায় চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। আর তখন—

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরব পদ
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ
গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

(বিচারক)

অন্যায় আর অপশাসনকে প্রতিহত করার জন্য নির্ভীক রামশাস্ত্রী মশাই বিচারকের পদের মতো সম্মানজনক পদটি অবলীলায় তুচ্ছ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। এই তো বিদ্রোহের আসল মুহূর্ত—বিপ্লবের পরম লগ্ন। মাধো ও রাম শাস্ত্রী—উভয়ের পরিণতি তাই দুঃস্থ ও দরিদ্র জীবনে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেলেও, তারই মধ্যে পাওয়া যায় বিদ্রোহ আর বিপ্লবের অভেদমন্ত্র, সাথে সাথে পাওয়া যায় সর্বহারার বাঁচার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার। এদের চরিত্রের মধ্য দিয়েই কবি সর্বহারার মানসিক জয়ের সীমাহীন তৃপ্তির ছবি তুলে ধরেছেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছেন দাউ দাউ ক'রে। তাইতো কবি এখানে মার্ক্সবাদী বিপ্লব-তত্ত্বের সুনিপুণ প্রয়োগ ঘটাতে সফল হয়েছেন, সন্দেহ নেই; যেন আপাতঃপক্ষে তিনিই এই তত্ত্বের আর এক অন্যতম রূপকার!

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কবি বৈপ্লবিকধ্যান-ধারণার শুধু তাত্ত্বিক রূপকারই ছিলেন না, বরং এ ব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিশেষ চিন্তাধারাও ছিল। ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সফল বিপ্লবগুলি কবির মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেগুলি তাঁকে এই বিশ্বাসে বিশ্বস্ত করেছিল যে, 'বিপ্লব অন্যায়ের

অবসান ঘটিয়ে মানবমুক্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দেয়'। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের অস্ত্র হিসাবে বিপ্লব বা বিদ্রোহ যে কতটা কার্যকর হতে পারে, তা কবি রাশিয়া ভ্রমণকালে রুশ-বিপ্লবোত্তর সমাজবাদী সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাইতো তিনি রাশিয়া ভ্রমণকালে বিপ্লবের জয়গান গেয়েছেন বাস্তব রাজনীতিকের মতোই; 'রাশিয়ার চিঠি' তৃতীয় পত্রে তাই তিনি লিখেছেন—

> একদিন ফরাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল···অসাম্যের তাড়নায় সেদিন সেখানকার (ফ্রান্সের) পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লব সাম্য, সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। এদের এখানকার (রাশিয়ার) বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছে।[৯৬]

প্রকৃতপক্ষে, কবির বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনায় একটা স্থায়ী অপূর্ণতা থেকে যেত, যদিনা তিনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সফরে যেতেন। একটা সমাজের জীবনে বিপ্লব যে কী ব্যাপক ও অভূতপূর্ব প্রগতি আনতে পারে তা তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় এসে সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারলেন। ফলে "তাঁর জীবনের এযাবৎকাল গড়ে-ওঠা অনেক ধারণা এখানে এক আঘাতে পাল্টে যায়। তাঁর এতদিনকার চিন্তাধারার মধ্যে, ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তবের যে অমিল প্রতিদিন তাকে আঘাত করছিল, তার কারণ তিনি অনেকটাই খুঁজে পেলেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার পর। এতদিন ধরে পুঁজিবাদী ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশে

এর জনবিরোধী চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেও এর সমাধান কোথাও তিনি খুঁজে পাননি। এবার সে-সব অনেক কিছুরই সমাধান তিনি এখানে খুঁজে পান। তাই সোভিয়েত ব্যবস্থার সবকিছু মনে-প্রাণে গ্রহণ না করলেও মানব-সভ্যতাকে তা যে স্থায়ী উৎকর্ষ দিয়েছে, এ মন্তব্য তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল। এ মন্তব্যও তিনি করলেন যে "অসম্ভব নয়, আজকের রুগ্ন যুগের বলশেভিকবাদই একমাত্র চিকিৎসা।"[৯৭] কারণ বলশেভিক-বিপ্লব রুশ সমাজের যে সার্বিক প্রগতি এনেছিল তা তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি 'রাশিয়ার চিঠি'র পঞ্চম পত্রে লিখেছেন—

> রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্য এত বড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে আমি তা মনেও করতে পারিনি।[৯৮]

সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের এই যে প্রগতিমূলক দিক, সে-সম্পর্কে কবি আরো লিখেছেন—

> সোভিয়েতরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার, বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয়নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্য জমি চাষ করে এসেছে, এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে, আনন্দের জন্যে মানব-জীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে।[৯৯]

এই কারণেই কবি বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের গুণকীর্তনে মুখর হয়েছেন, এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের যে সার্বিক প্রগতি-বিধানের চেষ্টা চলেছে

তা কবিকে অভিভূত করেছে। কবি তাই বলেছেন, "রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো।"[১০০] এই কারণেই নিপীড়িত মানুষের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার (যাকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্—'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' বলেছেন) প্রতি কবির ছিল সুগভীর আস্থা। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর মতো কবিও বিশ্বাস করতেন যে অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষেরা শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নিজেদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে নেবে এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে। আর তা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে তাদের নয়া শাসন-ব্যবস্থা, এক সুস্থ সমৃদ্ধ মানবসমাজ, যাকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' বা 'Dictatorship of the proletariat' নামে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত এই মানবিকতাপূর্ণ সমাজ গঠনের আশায় কবি আন্তরিকভাবে এ দাবি করেছেন যে—

আজকের মতো বলো সবাই মিলে
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে। ('কালের যাত্রা')

বলাই বাহুল্য, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রচেষ্টাই হল বিপ্লব, আর এই বিপ্লবের পথ ধরে সুস্থভাবে বাঁচার নিশ্চয়তা পাওয়ার মতো যে সমাজ গড়ে ওঠে তা'ই হল সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র। সুতরাং বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সুস্থ সমাজ— মার্ক্সীয় চিন্তাধারার এই দুটি উল্লেখযোগ্যভাবে বিশিষ্ট দিকের প্রতি কবিরও ছিল গভীর আস্থা ও আন্তরিকতা। এইখানেই এই দুটি দিকের বিষয়েও কবি ও মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর ধ্যান-ধারণায় নিবিড় সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

শোষণ-পীড়ন আর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কবির এই বিদ্রোহ বা বিপ্লবের মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা থেকেই। তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কারণ এদের পথ ধরেই দেশে ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে অপ্রতিহত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সংগঠিত পাপাচার, পুঁজির উচ্ছৃঙ্খলতা আর রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, যা অবশেষে বিশ্বমানবতার চরম বিপর্যয়েরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ আসলে সুবিধাবাদ আর শোষণবাদেরই নামান্তর। ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে ব্যাপকতর স্বার্থকে উপেক্ষা করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদেরই মূল উৎসটি। পুঁজিবাদের ফলে সংখ্যালঘু পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের অন্ধ স্বার্থে তাদের সীমাহীন শোষণ-পীড়নের শিকার হয় কোন দেশের ব্যাপক সংখ্যক জনগণ। আর সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে কিছু ধনী দেশ নিজেদের প্রভুত্বের স্বার্থে অন্যান্য দুর্বল ও দরিদ্র দেশ বা সাম্রাজ্যগুলির উপর আরোপ করে নিজেদের স্বেচ্ছাচারী শাসন।[১০] এমত অবস্থায় সমস্ত সমাজ-জীবন বিষিয়ে ওঠে; আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সহজ গতি হয় বিপন্ন। তাছাড়া পুঁজিবাদের পথ ধরেই সমাজে মানুষের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বিস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে এবং দরিদ্রের উপর ধনীর শাসন-শোষণ চেপে বসে। তখন ধনীর স্বৈরাচার ও উৎপীড়ন স্বীকৃত প্রথায় পর্যবসিত হয়; সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্দিন। ধনীর শাসন-শোষণের চাপে সে হয়ে উঠে দিশেহারা ও অবশেষে সর্বহারা। কবি

পুঁজিবাদের এই করাল রূপটি তাঁর রচনায়, বিশেষতঃ তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন সুনিপুণভাবে; লক্ষ্য হল পুঁজিবাদের বিভীষিকা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের যোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ধনী, বিলাসী, স্বৈরাচারী মানুষের সীমাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারী শাসন-শোষণের নিটোল ছবি তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় কবি জমিদারী শাসনের চরম দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, জমিদারী অত্যাচারের ফলেই দরিদ্র প্রজাকে ভিটেমাটি ছেড়ে পথে নামতে হয়; অবশেষে জমিদারের ভণ্ডামির চাপে পড়ে তাকে চোর-বাটপারের বদনাম মাথায় নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয়। কবি এই কবিতায় আরও একটি বড় সত্য তুলে ধরেছেন তা হল—ভদ্রতার মুখোশের অন্তরালে সংঘটিত ধনীর পাপাচার আর কদাচারের সীমাহীন বিশালতা। স্বাভাবিকভাবেই শোষক-জমিদারের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলাই কবির এই কবিতার লক্ষ্য।

'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি মাত্র দুই বিঘা জমিকে নিয়ে দুঃস্থ প্রজার উপর ধনী-বিলাসী জমিদারের শোষণ-পীড়নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এই দুঃস্থ প্রজাটি হল উপেন; সব কিছু খুইয়ে তার এখন শেষ সম্বল শুধুমাত্র বিঘা দুয়েক জমি; জমিদার এই জমিটুকুর সম্বলটিও কেড়ে নিতে চায়; কারণ তাহলে উপেনের জমির লাগোয়া তার যে বাগানটা আছে সেটা লম্বা ও চওড়ায় সমান হবে। তাই তার উপেনের জমিটুকু চাই-ই চাই। কাকুতি-মিনতি করে, কেঁদে কেটে উপেন জমিদারকে বলল—

……'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে-মাটি সোনার বাড়া,

দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া।'

('দুই বিঘা জমি')

ক্রুদ্ধ, রুষ্ট জমিদার খল-নায়কের চতুর হাসি হেসে বলে—

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে'।

('দুই বিঘা জমি')

কিন্তু কুচক্রী জমিদার গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র ক'রে মিথ্যা দেনার দায়ে উপেনকে জড়িয়ে মামলা রুজু করে এবং আদালত থেকে ডিক্রী পেয়ে উপেনের জমিটুকুর দখল নেয়। উপেন আর কি করে! নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে সন্ন্যাসীবেশে পথে বেড়িয়ে পড়ল সে এবার। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে কত নগর নগরী, মনোরম দৃশ্যাদি দেখল। কিন্তু তার মন ভরল না এতটুকু। মন যে তার পড়ে আছে সাত পুরুষের ভিটে ঐ বিঘা দুয়েক জমিটার উপর। তাই বছর পনরো-ষোলো পরে সে তার জন্মভূমি, পারিবারিক ঐতিহ্যের স্মৃতি-বিজড়িত জমি-খানি একবার চোখের দেখা দেখতে এল! কিন্তু সে হতাশ হল। জমিদার জমিটাকে নিজের মতো ক'রে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছে; ফলে সেদিনের সেই দুই বিঘা জমি আজ সম্পূর্ণ আলাদা রূপ পেয়েছে; ফুলে-ফলে, রঙ-বাহারী পাতায় সে আজ নতুন সাজে সেজেছে। উপেনের মনে ভীষণ অভিমান হল জননী জন্মভূমি জমিটুকুর উপর। বাইরে তার যতই সাজ-সজ্জা থাক না কেন, জমিদার ঐ সাজ-সজ্জার আড়ালে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসী-বাঁদীই করে রেখেছে বলে উপেনের মনে হল। তাঁর মনটা তাই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চমকে উঠল। অবশেষে প্রাচীরের কাছে সেই পুরনো আমগাছটাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে অভিমানী মন নিয়ে তার তলায় গিয়ে বসল উপেন। পুরনো দিনের কত স্মৃতিই না তার মনে ভেসে উঠল। স্মৃতির সাগরে সে যখন ভাসছে, ঠিক তখন দম্‌কা হাওয়ায় দুটি আম তার কোলের কাছে এসে পড়ল। জননী জন্মভূমির স্নেহের দান ভেবে সে আমদুটিতে মাথা ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা

জানাল। কিন্তু এমন সময় সেই বাগানের এক উড়ে মালি উপেনের হাতে আম দেখে চিৎকার করে তাকে গালি-গালাজ করতে লাগল। অবশেষে তাকে ধরে নিয়ে গেল জমিদারের কাছে। সপারিষদ মাছ ধরার বিলাসিতায় ডুবে ছিলেন জমিদার। সব শুনে ক্রুদ্ধ জমিদার বলে—

'মারিয়া করিব খুন।'

('দুই বিঘা জমি')

আর এদিকে—

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'

('দুই বিঘা জমি')

সকলের তিরস্কার ও কটূক্তি নীরবে সহ্য করে নিয়ে উপেন বিনীতভাবে আম দুটি ভিক্ষা চায়, বলে—

'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়'

('দুই বিঘা জমি')

জমিদার জববর হাসি হেসে বলে—

'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়'

('দুই বিঘা জমি')

'চোর' অপবাদে উপেনের চোখ ফেটে জল এল। এ আম তার নিজেরই জমির, অথচ এর জন্যই সে আজ বদনামের ভাগী। তার দুঃখ হল এই ভেবে যে—

আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!

('দুই বিঘা জমি')

সতি-সত্যিই জমিদারেরা সেদিন উপেনকে 'চোর' এই অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিল। অথচ এই জমিদারই আসল চোরের মতো উপেনের শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে, তাকে বানিয়েছে পথের ফকির। তাইতো উপেনের শেষ মনোবিশ্লেষণটি আমাদের সকলের

চিরকাল ধরে মনে রাখার মতো ; জমিদার যখন 'চোর' বদনাম দিল, তখন উপেন বলে—

আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে ॥
('দুই বিঘা জমি')

এই 'দুই বিঘা জমি' কবিতার ছত্রে ছত্রে কবি ধনীর শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে যে ধিক্কার-বাণী উচ্চারণ করেছেন তাতে বিপ্লবমুখী জনমত গড়ে-ওঠাটাই স্বাভাবিক ; এবং কবিও সেটাই চেয়েছেন আন্তরিকভাবে। নইলে ধনীর শোষণ-শাসনের আর অপশাসনের করাল রূপের এমন সুনিপুণ ছবি তিনি কখনও এত যত্ন করে আঁকতেন না, বলতেন না কখনও এই কঠোর সত্যটি যে—

এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
('দুই বিঘা জমি')

পুঁজিবাদী সমাজের শোষণমুখী প্রকৃতির সহজ ব্যাখ্যা এর চেয়ে আর কীইবা হতে পারে! ধনী জমিদারের এই সীমাহীন অর্থলিপ্সা, ক্ষমতালিপ্সা তথা স্বার্থপরতা সম্পর্কে কবির এই যে দৃঢ় বক্তব্য, তা তো মার্ক্স-এঙ্গেলস কর্তৃক প্রচারিত শোষক-বুর্জোয়ার চরিত্র—বিশ্লেষণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাঁরাও বলেন, শোষক বুর্জোয়া মানুষ নিজের মুনাফাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করবার জন্য শ্রমিকদের শোষণ করে, তাদের বাড়তি শ্রম করতে বাধ্য করে, তাদের শ্রমের মূল্যে অর্জিত মুনাফা নিজের ভাণ্ডারে রাখে। আসলে শ্রমিককে শোষণ না করে বুর্জোয়া পুঁজিপতির মুনাফা কখনও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে পারে না ; তাই তো তাকে কাঙালের সমস্ত সম্পদ চুরি করতে হয়, চুরি করতে হয় শ্রমিকের শ্রম। এদিক থেকে ধনীর শোষণ-পীড়ণের স্বরূপ বিশ্লেষণে কবি এবং মার্ক্স-এঙ্গেল্স্-এর চিন্তাধারার মধ্যেকার এই নিবিড় একাত্মতা চোখে পড়ার মতো। 'দুই বিঘা জমি'র সর্বহারা উপেনকে

তাইতে কবি হৃদয়ের সমস্ত আকুতি উপচে দিয়ে চিত্রিত করেছেন।[১০২] "নিজে শ্রেণীগতভাবে জমিদার হয়েও এই কবিতা লেখার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সাহস আছে, সততা আছে।" [১০৩] আর এই সাহস ও সততা যে শোষিত সর্বহারা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এবং শোষণের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানানোর তা বলাই বাহুল্য। ধনীর শাসন-শোষণকে বিরোধিতা করার কবির এই যে মানসিকতা তা তাঁর এক সহজাত প্রবণতা, সন্দেহ নেই। নইলে কি গায়ে জমিদারি রক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি 'রাশিয়ার চিঠি'তে এ সত্য স্বীকার করতে পারতেন যে "জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, চাষীর"।[১০৪]

কবি শুধু জমিদারি শোষণ-পীড়ন আর পুঁজিবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হননি, হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণমুখী চরিত্রকে কবি তাঁর কবিতায় বারে বারে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের ফলে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষকে চিরকাল অন্ধকারে পড়ে থাকতে হয়; তাদের অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটে না। অথচ তাদের শ্রমের বিনিময়েই পুঁজিপতির মুনাফা অর্জিত হয়, তাদের শ্রমের মূল্যেই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার রথের চাকা আবর্তিত হয়। তবু কিন্তু মুনাফালোভী শাসকেরা কখনও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের দিকে তাকায় না, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা করে না, বরং তাদের শোষণ-পীড়নের চাপে অবদমিত করে রাখে—যাতে তারা তাদের (শোষকদের) মুনাফা লাভের পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে উঠতে পারে, যাতে তারা তাদের দাসানুদাস হয়ে চিরকাল তাদেরই উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থ-সিদ্ধির পথে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। শোষণমুখী সমাজ-ব্যবস্থায় এই সংকীর্ণ গতি-প্রকৃতির নিটোল ছবি কবি এঁকেছেন 'ওরা কাজ করে' কবিতায়। এখানে কবি দেখিয়েছেন যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে কিছু বিলাসী, অকর্মণ্য, বিত্তবান মানুষের স্বার্থে বৈচিত্র্যহীন, একঘেঁয়ে কাজ সারাজীবন ধরে করে চলতে বাধ্য করা

হয়েছে। ফলে তাদের জীবনধারার কোন পরিবর্তন নেই, নেই জীবনের শখ-আহ্লাদ, নেই উচ্চবাসনা; আছে শুধু কাজ, আছে এই কাজের মধ্য দিয়ে ধনীর মুনাফালাভে সাহায্য করার উপরি চাপ। তাই ওরা কাজ করে, 'যুগ-যুগান্তর' ধরে 'জীবণে-মরণে' 'ওরা কাজ করে'; তাইতো—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

... ...

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

('ওরা কাজ করে')

এই অংশে কবির বক্তব্য হল এটাই যে খেটে-খাওয়া মানুষ যুগ যুগ ধরে যে কাজ করে চলেছে তা তাদের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের স্বার্থেই করে চলতে বাধ্য করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী মুনাফাবাজ বিদেশীরা একের পর এক আসছে ও যাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাজ করে যাওয়ার চিরন্তন প্রবাহ থেকে এতটুকু মুক্তি নেই। যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আসুক না কেন, সেই শক্তিই ওদের কাজের মূল্যে মুনাফা করে নিচ্ছে; তাই ওদের দিয়ে ঐতিহ্যগত কাজ করিয়ে নিতে সব শক্তিই তৎপর। তাই ওরা কাজ করে, কাজ করতে হয় ওদের। আর একটার পর একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এসে ওদের শ্রমের ফসল লুটে নেয়। কবি এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের ছবি আঁকতে গিয়ে বলেছেন—

কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল ;
বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।
... ...
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনল-নিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

('ওরা কাজ করে')

কবির এই বর্ণনা অনুযায়ী সাম্রাজ্যলোভী, মুনাফাবাজ, স্বার্থান্ধ উচ্ছৃঙ্খল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একের পর এক (এদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে) এসেছে উদ্ধত গতিতে, জয়ডঙ্কা বাজিয়ে, তেজ দেখিয়ে, পথের ধূলো ছিটিয়ে—চারিদিক অন্ধকার করে। ভারতস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্দাম স্বেচ্ছাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার সজীব ও স্বচ্ছ বিবরণ তুলে ধরে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত প্রকৃতি ও লাগাম ছাড়া উদ্দাম চরিত্র সম্পর্কে জগতবাসীকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে কবি 'কালান্তর' পর্যায়ের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক নিগূঢ় বক্তব্য তুলে ধরে সখেদে বলেছেন—

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে

> হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ·· ···সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।···ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। [১০৫]

সুতরাং সভ্যতা আর আধুনিকতার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে যে কী বিভৎস বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে, অধীনত দেশগুলিকে কী ব্যাপক পরিমাণ শোষণ-পীড়নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা কবি জোরালো-ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর এই সুগভীর বক্তব্যে।

এদিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার জনক-প্রতিম চিন্তাবিদ লেনিনের (V. I. Lenin) মতো কবিও বিশ্বাস করেন যে দুর্বিনীত, উদ্ধত, স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুনাফালাভের আশায় নিষ্ঠুরভাবে একটার পর একটা সাম্রাজ্য গ্রাস ক'রে অধিকৃত সাম্রাজ্যগুলির সম্পদ ও অর্থকরী প্রাকৃতিক উৎসাদি লুঠ করে চলেছে। তাদের নিষ্ঠুরতায় নেকড়ের হিংস্রতা হার মানে, তাদের বর্বরতায় আদিম মানুষের বন্য উদ্দামতা চাপা পড়ে, তাদের নির্লজ্জ হৃদয়হীনতায় মানব-ইতিহাস কলুষিত হয়ে ওঠে। তাইতো কবি সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সেই সীমাহীন নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে বলেছেন—

> এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত হয়েছে। এই মানব-পীড়নের মহামারী

> পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।[১০৬]

তাই কবির সুদৃঢ় বিশ্বাস হল এই যে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়ে উঠলে তার পরিণতিতে অনিবার্যভাবে "বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি" ('ঝড়ের খেয়া')। উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরে শুধু মিথ্যা-শঠতা, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনাই বেড়ে ওঠে না, বেড়ে ওঠে দুর্বল-অক্ষমের (দেশের) উপর সবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অখণ্ড আধিপত্য বজায় রাখার সব রকমের অবৈধ ও উদ্দাম প্রয়াস ও। প্রাধান্যলোভী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই অপপ্রয়াসের নিটোল ছবি কবি তুলে ধরেছেন 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন কেমন নির্দয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন দুর্বল চীনের উপর শাসন-শোষণের জোঁয়াল চাপিয়ে দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন—

> একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করান হইল। এমনতর নিদারণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল: "আমি অহিফেন খাইব না।" ইংরাজ বণিক কহিল 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি ধরিয়া বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া, অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল; দিয়া কহিল 'যে অহিফেন খাইলে, তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরাজরা চীনে এইরূপ অপরূপ ব্যবসা চালাইতেছে। যে জিনিস কোনমতেই চাহে না, সেই জিনিস তাহার এক পকেটে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া ও আর এক পকেট হইতে তাহার উপযুক্ত মূল্য তুলিয়া লওয়া হইতেছে। অর্থ সঞ্চয়ের এইরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা হয়, তবে নিতান্তই ভদ্রতার

খাতিরে। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকট মরণ বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতেছে। (১২৮৮)[১০৭]

আসলে কবি বুঝতে পেরেছেন যে সাম্রাজ্যবাদ বাণিজ্যবৃত্তির আড়ালে একটা গোটা দেশকে নপুংসকে পরিণত করতে চাইছে, তারপর আর একটি দেশকে, তারপর আরো একটিকে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ববাজার দখলের চেষ্টা করে ক্রমাগত। তাইতো তাঁর বিশ্বাস, বাণিজ্যবৃত্তি শুধুমাত্র আর তুলাদণ্ডেই আবদ্ধ নয়, বাজার দখলের মধ্যেও প্রসারিত। কবি বলেছেন, "সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব মতে বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে।"[১০৮] প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্য দখল ও তার উপর আধিপত্য বিস্তারের বাসনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বাণিজ্যের আশ্রয় নিচ্ছে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের লোভ দেখিয়ে স্বাধীন অঞ্চলগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করছে। আর উপনিবেশগুলিকে অধীনত রেখে তাদের সম্পদ আহরণ করার জন্য সাম্রাজ্য-লোভী দেশগুলি তখন উলঙ্গ আত্মপ্রকাশে মেতে ওঠে। তাইতো তখন উগ্র জাতি-প্রেম নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চরম উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে থাকে ; তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিভীষিকা ও তাণ্ডবতা। কবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদীদের এই সাম্রাজ্য দখলের উলঙ্গ প্রয়াসের ফলশ্রুতি বলেই মনে করেন। কারণ তিনি বুঝেছেন "স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম··· ।" ('নৈবেদ্য') : তাইতো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিতেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের এই বীভৎস চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন ·· ·····
ওই ক্রন্দনের কলরোল
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নি বন্যা তরঙ্গের বেগ,

বিষশ্বাসে ঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন—
মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
... ...
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
উর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।—
... ...
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি অভিমান—
... ...
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

('ঝড়ের খেয়া')

সাম্রাজ্যবাদের এই নিষ্ঠুর, বীভৎস, কলুষিত, শোষণমুখী চেহারার ছবি কবি কুশলী শিল্পীর মতো পরম দক্ষতার সাথে আরও স্পষ্ট ক'রে এঁকেছেন তার বহুখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতায়। এই কবিতায় কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক চরম নিষ্ঠুরতার সাথে আফ্রিকা সাম্রাজ্য দখল নেওয়ার করুণ আলেখ্য তুলে ধরেছেন। আফ্রিকা তখন সাগর পারে 'বনস্পতির নিবিড় পাহারায়'; 'নিভৃত অবকাশে' সে তখন ধীরে ধীরে গড়ে-ওঠা একটা সাম্রাজ্যের রূপ পেয়েছে। এমন সময় তাকে জবর দখল নিতে এল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বুক-ফাটানো নির্মমতায়। কবির সজীব বর্ণনায়—

হায় ছায়াবৃতা
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে
দস্যুপায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

('আফ্রিকা')

এই অংশে কবি সাম্রাজ্যবাদের যে করাল রূপের ছবি এঁকেছেন, তা লেলিন কর্তৃক বিশ্লেষিত সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদ যে আরও কত ভয়াল হয়ে উঠেছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তা কবি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন 'নৈবদ্য'র কতগুলি উক্তিতে; এখানে তিনি বিশ্বব্যাপী সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস তাণ্ডবতার ছবি এঁকে বলেছেন—

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম,—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
...   .
স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ আঁধারে।
...   .
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।

['নৈবেদ্য']

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই তাণ্ডবতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে একটা বিশ্বব্যাপী প্রলয়, মানব জাতির একটা ভয়ংকর সর্বনাশ তা কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন! উগ্র জাতিপ্রেম নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অপর জাতিকে গ্রাস করার যে দুনিয়াব্যাপী চক্রান্ত করেছে তাতে বিশ্ব-মানবতার অবক্ষয় একান্ত অবধারিত—এ সত্য তিনি আন্তরিক ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন যে—

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।
...   .
—চিতার আগুন

পশ্চিম সমুদ্র তটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুপ্ত সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

('নৈবেদ্য')

কবি এখানে শুধু সাম্রাজ্যবাদের করাল রূপের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এই ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বীভৎসতার বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণিত দৃষ্টিভঙ্গীও তুলে ধরেছেন জোরালোভাবে। লেনিন প্রমুখ মার্ক্সবাদীগণের মতো তিনিও তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত গড়ে তোলার দাবিতে সামিল হয়েছেন! এই কারণেই প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের তাণ্ডবতায় সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত রূপটি যখন প্রকট হয়ে উঠেছে, জার্মান যখন 'রণং দেহি' মূর্তিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদী বণিকের মানদণ্ড যখন পৃথিবীর রাজদণ্ড অধিকার করতে বেপরোয়াভাবে উন্মুখ হয়ে উঠেছে, কবি তখন বাণিজ্যের ছদ্মবেশে গড়ে-ওঠা সেই সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস চেহারা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করতে চেয়েছেন; 'সবুজপত্র' পত্রিকাতে 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে তাই তিনি লিখলেন—

> …বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব মতে বিবাহ ঘটিয়া গেছে।
>
> এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে! এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ কি বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব, রাজাও সেইখানেই, জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।
>
> কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহের দিনরাত আমদানি রপ্তানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর

> ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নতুন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব, এই সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে!
>
> এখন মুস্কিল হইয়াছে জার্মানীর। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছের গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গস গস করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে, আমি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া খাইব।[১০৯]
>
> ('লড়াইয়ের মূল')

কবি যখন এই লেখা লিখছেন তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য দখলের নেশায় উন্মত্ত, পৃথিবীর শান্তিবাদিগণ (যেমন রঁম্যা রঁল্যা, ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ) এই শক্তির দ্বারা হয় কারারুদ্ধ, না হয় নির্বাসিত। প্রকৃতপক্ষে, কবি বুঝতে পেরেছিলেন যে 'জোর যার মুলুক তার' (might is right) নীতির ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সারা পৃথিবীর শান্তি-সমৃদ্ধি ধ্বংস করছে। তাইতো তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন খড়গহস্ত।

কবির এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা আরো পরিণত ও দৃঢ় হয়েছে তাঁর পরম মানবতাবাদী আদর্শের স্পর্শে। মানবকল্যাণের আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ কবি তাই কখনও স্বীকার করেন না যে সাম্রাজ্যবাদই সমাজের একমাত্র সত্য ও তার শেষ পরিণতি। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে কখনও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। তাই সাম্রাজ্যবাদের অবসানের ধারণাতেই কবি সমধিক আগ্রহী। 'ওরা কাজ করে', 'আফ্রিকা' প্রভৃতি কবিতাতে সাম্রাজ্যবাদের ভয়াল চিত্র

তুলে ধরলেও কবি এগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী অবসান বা বিনাশের কথাও প্রচার করেছেন পরম আশাবাদের সুরে। তাইতো তিনি বলেছেন উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আসে আসুক, হানে হানুক নিষ্ঠুর আঘাত, তবু।

জানি তার ও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া-জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।
('ওরা কাজ করে')

হ্যাঁ, কবির দৃঢ় বিশ্বাস,—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও সরে যেতে হবে, পিছু হট্‌তে হবে সাম্রাজ্যবাদকে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনে জর্জরিত মানুষের চাপেই সাম্রাজ্যবাদকে বিলুপ্ত হতে হবে, সম্রাজ্যবাদকে ঘিরে গড়ে-ওঠা হিংসা ও নিষ্ঠুরতাকেও বিধ্বস্ত হতে হবে। তাইতো কবি সাম্রাজ্যবাদী হিংসা ও পাপাচারকে নির্মূল করার জন্য সকলের জাগ্রত বিবেকের কাছে আবেদন করেছেন, বলেছেন—

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
...   .
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও মানহারা ওই মানবীর দ্বারে
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী। ('আফ্রিকা')

এই ভাবেই কবি সাম্রাজ্যবাদের অবসানান্তে এক সুস্থ, হিংসা-শূন্য, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত মানবিক সমাজ গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সমাজের সাথে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ প্রচারিত ও লেনিন সমর্থিত সমাজবাদী বা সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার প্রগাঢ় একাত্মতা রয়েছে।[১১০]

রাশিয়া ভ্রমণকালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজ তাই কবিকে ব্যাপক-ভাবে উদ্বেলিত করেছিল। এই কারণেই মানুষের সাথে মানুষের সহজ সম্পর্ক বজায় রাখা যায় এমন সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে কবির গভীর আন্তরিকতা ছিল। তাইতো রাশিয়ার সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের কথা চিন্তা করেছে।[১১১]

প্রকৃতপক্ষে, কবির মনে এমন সুস্থ, সহজ, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ও মানবিকতাবোধে উদ্দীপিত সমাজ গঠনের লক্ষ্য ছিল বলেই তিনি পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে কোন মতেই স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাইতো ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের করাল রূপে আতঙ্কিত কবি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাইনি?
>
> ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর

> শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইয়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। [১১২]

সাম্রাজ্যবাদী অপশাসন সম্পর্কে কবির বিতৃষ্ণা যে কত গভীর তা এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ব্রিটিশের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি কবির বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের কঠোরতার রূঢ় আঘাতে ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছে, হয়ে উঠেছে 'দেউলিয়া'—এ-কবিরই আত্মস্বীকার। তিনি সারা-জীবন ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূঢ়তা দেখেছেন, ব্রিটিশের দমন-পীড়নে ভারতের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার ছবি দেখেছেন, সর্বোপরি ভারতকে 'লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা' হয়ে উঠতে দেখেছেন ধীরে ধীরে। তাইতো ভারতে ব্রিটিশের শাসনকে তিনি কখনও মনেপ্রাণেস্বীকার করে নিতে পারেননি ; বরং তাঁর কাছে ভারতের ব্রিটিশ-শাসন সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধরে ভারতেরই মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মারণযজ্ঞের হাতিয়ার বলেই মনে হয়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটেন নিজের প্রগতির স্বার্থে ভারতকে ঔপনিবেশিক দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে, ভারতের সম্পদ ইচ্ছামতো ভোগ-ব্যবহার করেছে এবং ভারতের উপর চালিয়েছে সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার। ফলে ভারত ক্রমশঃ দুর্বল ও দুঃস্থ হয়ে পড়েছে এবং ভারতীয়রা তাদের জীবনের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও সম্পদের জগৎ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এটাই ছিল কবির চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা। আর তাঁর এই অভিজ্ঞতাটি আরো প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর রাশিয়া সফরে। "রাশিয়ায় জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সার্বিক উন্নতির চেষ্টা দেখে

কবিচিত্তে বৃটিশ শাসিত দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের কথাটাই বেশী করে জেগেছে।"[১১৩]

কবি রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিচার ক'রে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ যে কত বিপন্ন ও অসহায় তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাইতো তিনি 'রাশিয়ার চিঠি'র পঞ্চমপত্রে লিখেছেন ঃ

> আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক, মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর-বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল তখন বুঝতে পারলুম সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে—কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।
> রাশিয়ার সমস্ত দেশ প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এতবড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারিনি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' এর আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি।[১১৪]

কবির এ বক্তব্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক প্রভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-সম্পর্কিত কবির এই মনোভাব আরো জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সদস্যা মিস ইলিনর র‍্যাথবোনকে

লেখা কবির একটি চিঠিতে। মিস্ র‍্যাথবোন ভারতীয়দের প্রতি কটাক্ষ ক'রে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এর প্রতিবাদেই কবি মিস্ র‍্যাথবোনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই চিঠিটি লিখেছিলেন। মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠি ও কবির প্রত্যুত্তরের ঘটনাটি হল এই যে :

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন ঐ বছরের ২৮শে মে তারিখে মিস্ র‍্যাথবোন ভারতীয়দের প্রতি এক খোলা চিঠিতে মোটামুটি একথা লেখেন যে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষকে সাহায্য করাই ভারতীয়দের পক্ষে মঙ্গলজনক; কারণ, তাহলেই ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারটি ভাবা যেতে পারে। অথচ ভারতীয়রা পুরানো ইতিহাস, বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা মনে রেখে ব্রিটিশ পক্ষকে সাহায্য করছে না। কিন্তু ব্রিটিশ ভাবধারা ও রাজনীতি থেকে ভারতীয়রা যে আকণ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছে, তার জন্যই আনুগত্য প্রদর্শনের দায়িত্বটা তাদেরই। ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা মিস্ র‍্যাথবোনের এই অবমাননাকর চিঠিটির অনুবাদ ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতে পড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর একবার এ ধরনের নগ্ন ও নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশে কবি ব্যথিত ও বিচলিত হন। তিনি ৫ই জুন তারিখে এ চিঠির যে প্রত্যুত্তর দিলেন (পত্র-পত্রিকার মারফৎ) তাতে তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে; তিনি লিখলেন :

> ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস্ র‍্যাথবোনের 'খোলা চিঠি' পড়িয়া আমি গভীর বেদনা বোধ করিয়াছি।···
> ···আমাদের যে সকল তথাকথিত ইংরেজ বন্ধু মনে করেন যে তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিকের আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে।···
> ···আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতাব্দীকাল

দৃঢ় মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাঁহারা আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অপমান শীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে।

···ব্রিটিশরাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্যই কি তবে আমরা ইংরেজদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। যখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অস্ত্র তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছে না।···

···মিস্ র‍্যাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণতি পূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্ত-চুম্বন করিব, কেননা সেই হাত আমাদিগের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। কোন একটা গভর্ণমেণ্ট ভালো কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের কথা শুনিয়া বিচার করিতে হইলে চলে না, সেই গভর্ণমেণ্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা দ্বারাই বিচার করিতে হয়। ইংরেজরা যে আমাদের অনাদরনীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এই জন্য নহে যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত

> করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে। আমার এরূপ মনে করা অনুচিত হইত না যে, ভদ্র গোছের ইংরেজরা ভারতীয়দের এই সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট মনে রাখিয়া অন্ততপক্ষে নীরব থাকিবেন এবং আমরা যে নিষ্ক্রিয় আছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞও থাকিবেন; কিন্তু তাহারা যে আমাদের অনিষ্টসাধনের উপর আবার আমাদের অপমানও করিবেন এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন, তাহা একেবারে স্বাধীনতার সকল সীমার বাইরে।[১১৫]

কবি এই চিঠিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকাময় দিকগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বীভৎসতাকেই শুধু তুলে ধরেননি, তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের রূঢ়তাকে সংযত করতেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে তিনি তাই লর্ড কার্জনের ভারত বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে লেখেন :

> কার্জন সাহেব…অত্যন্ত সহজ কথার মতো বলিয়াছিলেন তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়ালতন্ত্রের মধ্যে বিসর্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন? কার্জন সাহেব আমাদের সুখ দুঃখের সীমানা হইতেবহু ঊর্ধে বসিয়া ডাকিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একবারেবিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না? এ কেমনতর—যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদর আহ্বান করিবার জন্য মাল্য সিন্দুর হস্তে লোক আসে এবং

> এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়—এ কি আশ্চর্য এত বড়ো মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! [১১৬]
>
> (সফলতার সদুপায়)

কবি এখানে যে ইঙ্গিতটি স্পষ্টভাবে দিতে চেয়েছেন তা হল এই যে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের জন্য সাম্রাজ্যবাদরূপী মারণযজ্ঞের আয়োজন করে সেই যজ্ঞে ভারতীয়দের আত্মাহুতি দেবার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে কতটা মানবিকতাহীন ও নিষ্ঠুর তা কবির এই বক্তব্যে জোরালোভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেন, পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্যবাদের চেহারাই যে এরকম ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় তা কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ বা ইম্পীরিয়ালিজম্ যে বিশ্ব-মানবতা ও আন্তর্জাতিক সুস্থিতির পরিপন্থী এবং দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার সে-কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই কবি এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক সুরেই লিখেছেন :

> ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ যোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর যোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।[১১৭]

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের আধিপত্যের স্বার্থে দুর্বল ও ছোট-ছোট দেশগুলির উপর অপশাসন ও শোষণ চিরস্থায়ীভাবে বজায় রাখার চেষ্টাই করে থাকে; আর সেই মারণ চেষ্টার চরম

শিকারে পরিণত হয় অধীনত দেশগুলি। ফলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে দেখা দেয় সীমাহীন অরাজকতা। আর সেই অরাজকতার ছবি আঁকতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী।

সাম্রাজ্যবাদের এই মারণ রূপকে কবি কখনও স্বীকার করে নিতে পারেননি ; বরং তিনি এই রূপের কঠোর সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই কারণেই কবি সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজালে ঘেরা ও অপশাসনে ভরা সমাজের অবসান ঘটুক এবং এক নতুন, সুস্থ, সহজ-সুন্দর ও পারস্পরিক নির্ভরশীল সমাজ গড়ে উঠুক—এ কথা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত চিন্তা করে গেছেন।[১১৮] তাই আশাবাদী কবি পরম ভরসার সাথে বলেছেন, "মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"[১১৯] কারণ তিনি 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে' চরম ও অপ্রতিরোধ্য বলে আদৌ মনে করেন না। এইখানেই নিহিত রয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে কবির বিশ্বাস ও মার্ক্সীয় ধারণার নিবিড় একাত্মতা, সন্দেহ নেই।

১৯

সাম্রাজ্যবাদের মতো ফ্যাসিবাদেরও ঘোর-বিরোধী ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি ফ্যাসিবাদকে বিশ্ব-মানবতার পক্ষে চরম অভিশাপ বলেই মনে করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে আন্তর্জাতিক

রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় ঘটে। ক্ষমতা-মদে-মত্ত রাষ্ট্রের বিশ্ব-বিজয়ের আগ্রাসী কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ প্রকট রূপ ধারণ করে। এই কারণেই কবি ফ্যাসিবাদকে আন্তর্জাতিক গুণ্ডামি বলেই মনে করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন :

> ইদানীং পশ্চিমে ··ফ্যাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্য-কারণ তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়াতুর্মির দ্বারা উপর ও নিচের অসামঞ্জস্য ঘোচেনা। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে।·যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়—কিন্তু, সেই দেখাদেখি পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া।[১২০]

সমগ্র পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদের এই হিস্‌টিরিয়াসুলভ প্রাদুর্ভাবকে কবি মোটেই ভালো চোখে দেখেননি; কারণ ফ্যাসিবাদ যে ক্রমশঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা কবি উপলব্ধি করেছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে। তখন ১৯৩৫-৩৬ সাল। ন্যাৎসীবাহিনী ও ফ্যাসিবাহিনী সে-সময় বিশ্বগ্রাসের নেশায় রণং দেহি মূর্তিতে প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। আর সেই প্রস্তুতির সংবাদে বিচলিত কবি বুঝতে

পারলেন পৃথিবীর বুকে আর একটা বিপর্যয় নেমে আসছে। তাই সর্বংসহা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কবি ক্ষোভের সাথে লিখলেন—

তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;
জলস্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণ রঙ্গভূমি—
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে ॥
তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়—
সে পুরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশল বর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা ॥
দেবতা এলেন পরযুগে, মন্ত্র পড়লেন দানব দমনের
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ; ·····॥

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস !
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা—
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।

পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদের এই মদোন্মত্ত ও রণংদেহি মূর্তিতে কবি পৃথিবীরই ধ্বংসের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি তাই লিখেছেন—

·· তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফনা তুলে—

তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে। (পৃথিবী)

ফ্যাসিবাদের এই সর্বগ্রাসী ও মানবতাবিরোধী রূপের পরিচয় কবি বহু আগেই পেয়েছিলেন। তখন ১৯২৬ সাল। কবি সেবার মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী ইতালী সফর সেরে সুইজারল্যাণ্ডে আসেন। সেখানকার ভিলেন্যুভ গ্রামে গিয়ে কবি সেই গ্রামে ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা নির্বাসিত উদ্বাস্তু মানুষজনের সাথে পরিচিত হলেন। আর সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই কবি ফ্যাসিবাদী নিষ্ঠুরতার করুন বিবরণ লাভ করেন: সে-সম্পর্কে তিনি ৫-ই আগষ্ট তারিখে (১৯২৬) এক চিঠিতে এ্যাণ্ড্রুজকে লিখলেন:

·· ফ্যাসিবাদের পদ্ধতি ও নীতিসমূহ সমগ্র মানবতাকে উদ্বিগ্ন করে এবং (তাই) এটা কল্পনা করা অসম্ভব যে আমি তেমন কোনো আন্দোলন কখনও সমর্থন করতে পারি যে আন্দোলন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নির্দয়ভাবে দমন করে, বিবেক-বিরোধী নীতিনিয়মকে বলপূর্বক প্রয়োগ করে এবং যা হিংসা ও গোপন অপরাধের রক্তলাঞ্ছিত পথ ধরে অগ্রসর হয়। আমি বার বার বলেছি যে (উগ্র) জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মানসিকতা যা পাশ্চাত্তের অধিকাংশ জাতির দ্বারা ধর্মীয় দিক থেকে গড়ে উঠেছে তা সমগ্র বিশ্বের পক্ষে একটা বিপদ স্বরূপ।

[অনুবাদিত]

[···The methods and principles of Fascism concern all humanity and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses

freedom of expression, enforces observances that are against conscisence, and walks through a blood-stained path of violence and stealthy crime. I have said over and over again that the aggressive spirit of Nationalism and imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the west, is a menace to the whole world.] [১২১]

কবি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে ফ্যাসিবাদ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় সারা পৃথিবীতে অশান্তির বিষবাষ্প ছড়িয়ে চলেছে এবং এর নিষ্ঠুরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে উঠছে। তিনি তাই লিখলেন—

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
…সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন লির্লজ্জ অমানুষতা…।

(আফ্রিকা—সঞ্চয়িতা পৃ. ৭২২)

সত্যি সত্যিই এবার নির্লজ্জ ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। তখন ১৯৩৬-৩৭ সাল। ইউরোপ তখন ফ্যাসিবাহিনী ও ন্যাৎসীবাহিনীর ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের চাপে আতঙ্কিত ও বিব্রত। এমত অবস্থায় আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের সহায়তায় জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের উপর প্রতিক্রিয়াশীল অভিযান চালান।[১২২] নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চরম হয়ে উঠলে কবি তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন, এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দাবী তুলে জোরালোভাবে বলেন—

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই বিধ্বংসী জোয়ারকে অবশ্যই দমন করতে হবে। স্পেনে তমসাচ্ছন্নতা, জাতিগত কুসংস্কার, লুণ্ঠন ও যুদ্ধ-গৌরবের এই অমানবিক পুনঃ প্রকোপকে অবশ্যই চূড়ান্ত প্রত্যাঘাত করতে হবে। মানব সভ্যতাকে বর্বরতার দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

স্পেনীয় জনগণের এই চরম দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে আমি (তাই) মানবতার বিবেকের কাছে আবেদন রাখছি······ [অনুবাদিত]

[This devastating tide of international Fascism must be checked. In Spain this inhuman recrudescence of obscurantism, of racial prejudice, of rapine and glorification of war, must be given the final rebuff. Civilisation must be saved from its being swamped by barbarism.

In this hour of supreme trial and suffering of the spanish people, I appeal to the conscience cf humanity···[১২৩]]

স্পেনীয় জনগণের এই দুর্দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য বিশ্ব-মানবতার দরবারে কবির এই আকুল আবেদনের মধ্য দিয়ে যে কবির ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও গভীর মানবতাবাদী মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে শুধুমাত্র স্পেনীয় গণতন্ত্রের উপর আঘাত হেনেই ফ্যাসিবাদী অভিযান থেমে গেল না; বরং তা ক্রমে ক্রমে অন্যত্রও সংক্রামিত হল। তার

তখন সে কী ভয়ানক রূপ! কী ভয়ঙ্করই না তার দাপট! কবির তুলনায় তা যেন অনেকটাই এই রকম—

…বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়—
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুর হয়ে;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

(পৃথিবী, সঞ্চয়িতা, পৃ ৭০৭)

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের ঝড় যখন এরকম তাণ্ডবতায় মেতে উঠেছে তখন ১৯৩৭-৩৮ সাল। এই সময়েই ঘটল চীনের উপর জাপানের ফ্যাসিবাদী অভিযান। বিচলিত হলেন কবি। চীনের সাহায্যের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।[১২৪] চীনের জনগণের সাহায্য ত্রাণে তিনি নিজে অর্থদান করেন, চীনে প্রেরিত ভারতীয় চিকিৎসক দলটিকে তিনি শুভেচ্ছা জানান এবং কপট বুদ্ধ ভক্তিকে বিদ্রূপ করে তিনি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' কবিতায় লিখলেন—

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হলো বাঁকা, চোখ হলো রাঙা
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তুরী ভেরী গর গর শব্দে
কেঁপে উঠল পৃথিবী। [বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি]

এটাই হল কবির অভিজ্ঞতায় পাওয়া চীনের উপর জাপানের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের চাল-চিত্র। তাই কবি এই আগ্রাসনের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। এমত অবস্থায় জাপানী কবি নোগুচি সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে কবিকে আবেদন জানান। তিনি কবিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এশিয়ার নবজাগরণের স্বার্থে, সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, সহযোগিতা-ভিত্তিক প্রগতির কারণেই জাপান চীন-অভিযান চালিয়েছে। তাই নোগুচির আবেদন কবি যেন জাপানকে সমর্থন করেন। কিন্তু জাপানের এই নিছক রণোন্মত্ত মোহের অবসান একদিন না একদিন ঘটবেই এবং সেইদিন যুদ্ধবাজদের পরিতাপ করতেই হবে—একথা জানিয়ে তিনি নোগুচিকে এই মর্মে লেখেন যে ঃ

> আমি জনৈক টোকিও রাজনীতিবিদের এই (একটি) সাম্প্রতিক বক্তব্যটি পড়ে মজা পেয়েছি যে ইটালী ও জার্মানের সাথে জাপানের সামরিক মৈত্রী 'চূড়ান্তভাবে আধ্যাত্মিক-নৈতিক কারণেই' সম্পাদিত হয়েছে এবং এর পিছনে কোন বস্তুগত বিচার-বিবেচনা নেই। হতে পারে তা'ই। (কিন্তু) যেটা মজাদার নয় তা হল এই যে শিল্পী ও চিন্তাবিদেরাও এমন উল্লেখ-যোগ্য মানসিকতা যা সামরিক ঔদ্ধত্যকে আধ্যাত্মিক বাহাদুরিতে পরিণত করে তাকেই প্রতিধ্বনি করে চলেছেন।
>
> [I was amused to read the recent statement of a Tokyo politician that the military alliance of Japan with Italy and Germany was made for 'highly spiritual moral reasons' and had no materialistic

considerations behind them.' Quite so. What is not amusing is that artists and thinkers should echo such remarkable sentiments that translate military swaggor in spiritual bravado.] ১২৫

কবির এই চিঠি পেয়ে জাপানী কবি নোগুচি অপর একটি চিঠিতে জাপানের অভিযানকে সমর্থন করে যুক্তি স্থাপন করেন এবং কবিকে জাপানের বিরুদ্ধে সমালোচনা না করে এ ব্যাপারে অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকার অনুরোধ করেন। মানবতাবাদী কবি কিন্তু নোগুচির এই অনুরোধটিও রাখতে পারেননি। তিনি বরং নির্ভীকভাবে তাঁকে লিখলেন ঃ

> যে আপনি আমাকে নিরপেক্ষ থাকতে দেখতে চান সে-ই আপনি কেমন করে আশা করেন যে প্রথম আক্রমণকারীরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আগ্রাসন প্রত্যাহার করে না নেয় ততক্ষণ আমি (চীনের) চিয়াং কাই শেককে প্রতিরোধ অভিযান প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আবেদন করব?…
>
> আপনার দেশের জনগণ যাদের আমি ভালোবাসি তাদের সাফল্যের পরিবর্তে অনুশোচনাই কামনা করি।
>
> [You who want me be impartial, how can you expect me to appeal to Chiang Kai-Shek to give up resisting until the aggressors have first given up their aggression?…

Wishing your people whom I love,
not success, but remorse.][১২৬]

ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবি যে কতটা কঠোর হয়ে উঠেছিলেন তা এই বক্তব্যেই পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। আসলে, কবির মানবতাবাদী মনই কবিকে যুদ্ধবাজ-ফ্যাসিবাদকে কখনও স্বীকার করে নিতে দেয়নি, বরং এর বিরুদ্ধে তাঁকে জেহাদ ঘোষণা করতেই উদ্দীপিত করেছে। তাইতো বন্ধু-কবি নোগুচির আবেদন-অনুরোধ ব্যর্থ হয়ে গেছে। কবি মানুষের উপর মানুষের অন্যায়-অবিচারকে মনেপ্রাণে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারেননি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই কারণে পৃথিবীর যে প্রান্তেই মানব পীড়নের ঘটনা ঘটেছে কবি তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। "আমেরিকায় নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষদের উপর চাবুক মারা, জার-শাসিত রাশিয়ায় ইহুদি হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ানদের অত্যাচার স্পেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসি আক্রমণ, হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার—কোন অন্যায় কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।"[১২৭] জীবনের শেষ বয়সে কবিতা 'জন্মদিনে'-এ যুদ্ধবাজ সবলের দমন-পীড়নের নিটোল ছবি নিবিড় আন্তরিকতা দিয়ে তিনি এঁকেছেন, লিখেছেন—

ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংস গন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আর্বজনা কুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি॥
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

(জন্মদিন—সঞ্চয়িতা, গ্রন্থ ৭৮-৭৮)

মানুষ-জন্তুর এই আগ্রাসী কার্যকলাপকে কবি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে এসেছেন। কারণ, যে-কাজে মানবতার অবক্ষয় ঘটে, অপমৃত্যু ঘটে সুস্থিতি ও সংহতির, এমন কি যুদ্ধ-বাজ সবলেরও কোনও স্থায়ী কীর্তি তাতে রচিত হয় না। তাই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, তথা যাবতীয় যুদ্ধবাজ কর্মতৎপরতাকে কবি বিদ্রূপ করেছেন চূড়ান্তভাবে, বলেছেন—

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥

[জন্মদিন]

প্রকৃতপক্ষে, কবি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফ্যাসিবাদী সক্রিয়তা বা আগ্রাসী কার্যকলাপ বিশ্ব-মানবতার পক্ষে বিপর্যয়স্বরূপ। তাতে ব্যক্তিস্বার্থ হয়ত বা কখনো কখনো চরিতার্থ হলেও মহত্ত্বের কিন্তু কিছুই থাকে না, মানবিক কল্যাণও তাতে সাধিত হয় না। আসলে "দুর্বল অসহায়ের প্রতি সবলের যে পীড়ন, তাতে বীর্য নেই, আছে নিষ্ঠুরতা, মর্মান্তিকতা এবং পৌরুষের লজ্জাকর গ্লানি—একথা রবীন্দ্রনাথ আজীবন কতোভাবেই না বলে গেছেন।"[১২৮] আর তাইতো সবলের এই বিশ্ব-বিপর্যয়কারী ও আত্মহননকারী নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড প্রতিহত হোক এবং পৃথিবী জুড়ে এক প্রকৃত মানবিক যুগের সূচনা হোক—এটা কবি আন্তরিকভাবেই চাইতেন। তাই ১৯৩৬ সালে স্পেনে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী অভিযানের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত গড়ে তোলার জন্য

র‍ঁশা র‍ঁল্যা, আঁরি বাঁরবুস প্রমুখগণের উদ্যোগে যে বিশ্ব-শান্তিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর স্থায়ী শান্তির স্বার্থে ফ্যাসিবাদবিরোধী এক মানবিক বাণী প্রেরণ করেন; তাতে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে—

> শান্তিকে যদি যুদ্ধের নিছক অনুপস্থিতির চেয়ে বড়ো কিছু হতে হয়, তাহলে একে অবশ্যই ন্যায়ের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দুর্বলের অবসাদের উপর নয়। আবিসিনিয়ার শান্তির ভিত্তি স্পেনের যুদ্ধের বীভৎসতার চেয়ে কোন অংশে কম ভয়ানক নয়…।
> আমরা কখনও শান্তি পেতে পারিনা যদিনা এর পূর্ণ মূল্য দিয়ে একে আমরা চাই; এই মূল্য হল এটাই যে সবলকে অবশ্যই লোভী হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দুর্বলকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে (১৯৩৬)।
>
> [If Peace is to be anything more than the mere absence of war, it must be founded on the strength of the just and not on the weariness of the weak. The ground of peace in Abyssinia is no less ghastly than the howe of war in Spain…
> We can not have peace until we deserve it by paying its full price, which is that the strong must cease to be greedy and the weak must learn to be bold (1936)][১২৯]

কবি তাই মনে করেন যে পৃথিবীতে শান্তি-সমৃদ্ধি একমাত্র তখনই

আসতে পারে যখন ফ্যাসিবাদী, ন্যাৎসীবাদী প্রভৃতি আগ্রাসী শক্তির স্বার্থান্ধ ও আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ হবে। তিনি অবশ্য একথাও গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে কোন আগ্রাসী শক্তিই স্থায়ী নয়, বরং তার নিলর্জ্জ আত্মপ্রকাশের চূড়ান্ত মুহূর্তেই তার চরম বিনাশ ঘটে। তাইতো ফ্যাসিবাদী যুদ্ধেই ফ্যাসিবাদের মরণ নিহিত রয়েছে বলেই কবির দৃঢ় বিশ্বাস। ফ্যাসিবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি এই বিশ্বাসকে জোরালোভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন—"প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তাই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।"[১৩০] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবতায় ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন যখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তখন কবি ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত বিনাশের ইঙ্গিত পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—

> মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে…। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।[১৩১]

সত্যিই, মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাজয়কে আদৌ স্বীকার করে নেন নি, বরং মানুষের মহৎ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতার ধারণাতেই তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাই জীবনের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়েও তিনি মনে প্রাণে ফ্যাসিবাদের বিনাশ কামনা করেছেন। প্রতাপশালী ফ্যাসিবাদ যতই ক্ষমতাধর হোক না কেন মানব সভ্যতা ও বিশ্ব-মানবতা সম্পর্কে কখনও সে শেষ কথাটি বলতে পারে না—একথাও কবি জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেন। সেটা ছিল ১৯৪১ সালের জুন মাস। এবার ফ্যাসিবাদী শক্তি যখন রাশিয়া আক্রমণ করেছে কবি তখন জীবনের শেষপ্রান্তে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দারুণ উদ্বেগ নিয়ে তিনি কামনা করেছেন আগ্রাসী শক্তির পরাজয়।

৩০শে জুলাই বন্ধু প্রশান্তকুমার মহালনবিশ ও নির্মল কুমারী মহালনবিশ কবিকে অন্তিম দেখা দেখতে গিয়ে যখন জানালেন যে রাশিয়া জার্মানকে রুখে দিচ্ছে, তখন মৃত্যুদূতের হাতছানির মধ্যেও কবি আবেগে ফেটে পড়েন, উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন "পারবে, পারবে ওরাই পাববে"। অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রুশীরা অবশ্যই রুখতে পারবে, কারণ ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই মানব সভ্যতার বিরোধী সমস্ত শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—এটাই কবির আমৃত্যুলালিত বিশ্বাস। এই ঘটনাটি সম্পর্কে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'বাইশে শ্রাবণ'-এ নির্মলকুমারী মহালনবিশের বিবরণটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি লিখেছেন—

> ৩০শে জুলাই : আজ সকালে (কবির) অপারেশন, তাই দুজনেই ভোরে গিয়েছিলাম জোড়াসাঁকোয়। আমরা ঘরে ঢুকে সামনে যেতেই বললেন—'কি হে প্রশান্ত, আজকের কাগজে যুদ্ধের খবরটা কি? উনি (প্রশান্ত বাবু) বললেন—একটু যেন খবর ভালো। কাগজ পড়ে তোমনে হচ্ছে রাশিয়ান সৈন্য জার্মানদের একটু ঠেকাতে পেরেছে। (জার্মানরা) অত তাড়াতাড়ি এগোতে পারছে না। শুনে কবির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'পারবে, পাররে ওরাই পারবে। ভারি অহঙ্কার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং গোয়েরিং এখন দেখুক গোয়েরিং কী হয়। দুশমনরা! উনি বললেন, রাশিয়ানরা খুবই বীরত্ব দেখাচ্ছে, অসম্ভব লড়ছে। মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বরাবরই দেখেছি যুদ্ধে জার্মানরা জিতলে কবির মন খারাপ হয়ে যেত। তাই আজকের খবরে মন খুশী হল।[১৩২]

ফ্যাসিবাদী জার্মানদের পরাজয়ের সংবাদে কবি সত্যিই খুশী ও তৃপ্ত হয়েছিলেন। অন্যায়-শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ও ন্যায়-শক্তি তা যতই

দুর্বল হোক তার জয় অনিবার্য—কবির এই আন্তরিক বিশ্বাসটি রাশিয়া কর্তৃক জার্মানের যুদ্ধ প্রয়াস প্রতিহত হওয়ার মাধ্যমে অক্ষরে অক্ষরে ফলবতী হচ্ছে বলেই কবি আজ আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও পরম উল্লসিত। সবলের শোষণ-পীড়নের অবশ্যম্ভাবী অবসান এবং শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মহৎ মর্যাদার অনিবার্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কবির এই যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের দিক থেকেও কবির মানসিকতা মার্ক্সীয় ধ্যান-ধারণার সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কারণ মার্ক্স ও এঙ্গেলস বিশ্বাস করেন যে শোষিত মানুষের শোষণের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার আর কিছু নেই বলেই তারা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সবল-শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে শোষকের পরাজয় ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি অনিবার্য (inevitable)। তাইতো তাঁরা সবলের দম্ভকে রুখবার জন্য শোষিত মানুষকে উৎসাহিত ক'রে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন—

> সর্বহারাদের শৃঙ্খলছাড়া হারাবার মতো কিছু নেই।
> বরং জয় করার মতো তাদের আছে বিশ্বখানি। (তাই)
> দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এক হও।
> [The Proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all Countries, unite!][১৩৩]

সবলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষিত ও দুর্বলের ন্যায়শক্তির জয়ের অনিবার্যতা সম্পর্কিত এই মার্ক্সীয় মূল্যবোধটি কবির মনেও গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল। কবিও তাই মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর মতো ন্যায়-শক্তির জয়গানে মুখর হয়ে উঠে বলেছেন—

> আজকের মতো বলো সবাই মিলে
> যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
> যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
> তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে। ('কালের যাত্রা')

সুতরাং আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় সম্পর্কিত কবির এই বিশ্বাসটি যে সবল-শোষকের অনিবার্য পতন সম্পর্কিত মার্ক্সীয় মূল্যবোধের অনুরূপ তা বলাই বাহুল্য। কারণ কবিও মনে-প্রাণে এই মূল্যবোধেই বিশ্বাস করেন যে "(একদিন না) একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাওয়ার পথে।"[১৩৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কবি পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, শোষণবাদ তথা সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার দৃঢ় মানসিকতা পোষণ করেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। আসলে তিনি ছিলেন যে কোনও প্রকার সুবিধাবাদের ঘোর বিরোধী। শোষণ আর অপশাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। পুঁজিবাদকে নিয়ে মানুষের উপর মানুষের অন্যায়-আধিপত্য বজায় রাখার অপপ্রচেষ্টাকে তিনি কখনও স্বীকার করেননি। ধনী ক্ষমতাবান মানুষ দুঃস্থ-দরিদ্র-অসহায় মানুষকে নিজের উচ্ছৃঙ্খল শৃঙ্খলে বেধে ফেলুক—এটা কবি কখনও চাইতেন না। পুঁজিবাদ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে অনর্থক অসাম্য বজায় রাখে বলেই এই পুঁজিবাদকে তিনি সর্বৈবভাবে বিরোধিতা করেছেন। অনুরূপভাবে সাম্রাজ্যবাদেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উগ্র জাতিপ্রেমের দম্ভে সমস্ত বিশ্বে যে অরাজকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে চলেছে—তা কবি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্ব-মানবতার পক্ষে একটা ভয়ঙ্করতম বিপদ বলেই মনে করতেন। সাম্রাজ্যবাদের পরিণতি যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায়, বিশ্বব্যাপী অরাজকতায়, বিশ্বমানবতার ধ্বংসলীলায়—তা কবি অন্তর দিয়ে বুঝতেন। তিনি আরো বুঝতেন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উগ্রজাতিপ্রেম ও স্বার্থসর্বস্বতাই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। তাইতো কবি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদের কুশ্রী পরিণতির বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত গড়ে তুলেছেন। এদিক

থেকে মার্ক্সীয় সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সাথে কবির চিন্তাভাবনার আদৌ কোন ফারাক নেই। খাঁটি মার্ক্সবাদীগণের মতোই তিনিও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণিত মানসিকতা প্রকাশ করেছেন। অন্যায়, অপশাসন আর শোষণকেও কখনোই বরদাস্ত করেন নি তিনি। মানুষকে নিয়ে ব্যবসায়, মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-বঞ্চনার ঘটনাকে তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। সংকীর্ণ স্বার্থের তাগিদে মানুষের চরম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠাকেও তিনি মানবতার প্রতি অপমান বলে মনে করতেন। তাইতো জগত ও জীবন সম্পর্কে কবির ধারণা অত্যন্ত আন্তরিকতায় ভরপুর; তা যে কখনও বুর্জোয়াসুলভ নয় তা বলাই বাহুল্য। ফলে কবিকে চট্‌জলদি 'বুর্জোয়া কবি' বলে চিহ্নিত করাটা কোনমতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ যে 'বুর্জোয়া কবি' ছিলেন না, বরং ছিলেন মানব-প্রীতিতে ভরপুর হৃদয়বান কবি তা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের মানসিকতা থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় পাপাচারও অন্যায়ের ভয়াল রূপের ছবি এঁকে তার বিরুদ্ধে যেমন দৃঢ় জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তেমনি অন্যায় আর অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিক্ষোভের ছবি তুলে ধরে জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর কবিতায় সরাসরি 'বিপ্লব' (Revolution) শব্দটিকে ব্যবহার করেন নি ঠিক, কিন্তু মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর ধারণায় বিপ্লব বলতে যা বোঝায়, তা তাঁর কবিতায় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতার (উপরি-উক্ত) বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে কাহিনী-ধর্মী শোষণ-বিরোধী কবিতাগুলির কুশীলবদের কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের মহাস্ত্র হিসাবে বিদ্রোহ বা বিপ্লবই প্রধান হয়ে উঠেছে। মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে দৃঢ়মূল শোষণ ও অপশাসনকে প্রতিহত করতে হলে বিদ্রোহের পথ নিতেই হবে। শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জীবনের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার ও সুস্থ-সবলভাবে বাঁচার শেষ

হাতিয়ার হল বিপ্লব। এ ব্যাপারে তাদের সচেতন হতে হবে বৈকি। তাই মার্ক্স-এঙ্গেলস্ যেখানে শোষিত সর্বহারা জনগণকে শোষণের জোয়াল থেকে মুক্তির জন্য তাদের সচেতন ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে "দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এক হও" ("working men of all countries, unite!") এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, সেখানে কবি তাদের জীবনের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন, তাদের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে গিয়ে বলেছেন—

'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।'

('এবার ফিরাও মোরে')

এটাই তো কবির পরম বিপ্লবী মন্ত্র। এই মন্ত্রেই তো তিনি শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মনে বাঁচার প্রেরণা যুগিয়েছেন। এই মন্ত্রেই তো সাধারণ মানুষের মনের কবিতে পরিণত হয়েছেন তিনি। তাই তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীর কবি নন, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কবি নন। তিনি কবি সর্বসাধারণের, আপামর জনগণের। 'বুর্জোয়া কবি' বলে তাঁকে চিহ্নিত করাটা তাই একপেশে অভিমত, সন্দেহ নেই।

আমরা এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা করলাম তা থেকে মোটামুটি-ভাবে এই বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক 'বুর্জোয়া কবি' বলা যায় না। আমরা উপরের আলোচনাতে দেখেছি যে ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেন নি, অথবা বুর্জোয়া মানসিকতার প্রতিফলনও তার ব্যক্তি-জীবনে ঘটেনি। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান গড়ে তোলা, ধন-সম্পদের উচ্চ আসনে বসে দরিদ্রের প্রতি হৃদয়হীন হয়ে ওঠা, সাধারণ জনগণের প্রতি অবিচার করা—এসব ঘটনা রবীন্দ্র-জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

একথা ঠিক যে তিনি ঠাকুর পরিবারের মতো এক বিত্তবান পরিবারের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাই বলে কখনও বিত্তহীনের প্রতি তাঁর অনীহা, অবজ্ঞা বা বিরূপতার ভাব প্রকাশ পায়নি। নিজে শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ঠাকুর পরিবারে লালিত পালিত হয়েও সাধারণ, অশিক্ষিত, অ-সংস্কৃত, দুঃস্থ মানুষজনকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। বরং সুস্থ, স্বচ্ছল ও নিশ্চিন্ত জীবনের অধিকারী হয়েও তিনি দরিদ্র-জনসাধারণের প্রতি নিবিড় মমতা ও আন্তরিকতা বজায় রেখেছিলেন। দুঃস্থ-দরিদ্রের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল সুগভীর। দুঃখী মানুষজনের প্রতি তাঁর এই সমবেদনা ও সহানুভূতির মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার মনের সাহচর্যে। পিতা মহর্ষির দান-ধ্যানাদিমূলক কার্যকলাপ তাঁকে দুঃস্থের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। মহর্ষিও তাঁকে দরিদ্র-অসহায়দের প্রতি সমব্যথী ও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এ প্রসঙ্গে কবি 'জীবন স্মৃতিতে' নিজেই লিখেছেন—

> পিতা…আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে…। …আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন।[১৩৫]

দীন-দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি মমতা-ভরা এই যে দৃষ্টিভঙ্গী কবি মহর্ষিদেবের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন, তা তিনি সারা জীবন ধরে বজায় রেখেছিলেন।

এমন কি যৌবনে জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়েও প্রজা-সাধারণের স্বার্থকে তিনি কখনও উপেক্ষা করেন নি, তাদের অবস্থার প্রতি কখনও অবিচার করেন নি। আন্তরিক নিষ্ঠা ও গভীর মমতার

সাথে তিনি জমিদারীর কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। জমিদার মাত্রই পরান্নজীবী, বিলাসী, অকর্মণ্য, প্রজাপীড়ক, শোষক— এই যে সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তা জমিদার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। প্রজার স্বার্থে তিনি খাজনা মুকুফ করেছেন, দুঃস্থ প্রজাদের জমি দান করেছেন, অর্থ দান করেছেন এবং দুর্গত অবস্থায় তাদের জন্য উপযুক্ত ত্রানের ব্যবস্থা করেছেন। আর এই ধরণের প্রজাহিতকর কাজ করেই তিনি জমিদার হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং পেয়েছিলেন প্রজা-সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সুতরাং জমিদার থাকা কালেও তিনি অধিকাংশ জমিদারের মতো প্রজাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন নি, তুলে ধরেন নি বুর্জোয়া মানসিকতা, শোষণমুখীনতা ও স্বার্থসর্বস্বতা। প্রজা-শোষণের মধ্য দিয়ে জমিদারীর সম্পদ বৃদ্ধির বাসনাও কখনোই তাঁকে পেয়ে বসে নি (যদিও কখনো কখনো তাঁর অজ্ঞাতে নায়েব-পেয়াদার চাপ প্রজাদের সহ্য করে থাকতে হতে পারে) ; প্রজা পীড়নের প্রশ্ন তো আসছেই না। এই কারণে জমিদার হিসাবেও রবীন্দ্রনাথকে'বুর্জোয়া মানুষ' বলা যেতে পারে না। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে মোটেই বুর্জোয়ামনস্ক ছিলেন না।

আর কবি হিসাবে তাঁকে তো বুর্জোয় মনোভাবাপন্ন বলা যেতেই পারে না। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় তিনি সাধারণ মানুষের জয়গান গেয়েছেন, তাদের সাথে একাত্ম হওয়ার আকুতি প্রকাশ করেছেন, তাদের জীবনের সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায়, সাধারণ মানুষই যে সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, আর এই অংশকে উপেক্ষা করে জগত ও জীবনকে যে কখনোও অনুধাবন করা যেতে পারে না—একথা কবি অন্তর দিয়ে বুঝতেন। তাই তাদের প্রতি কবি ছিলেন আন্তরিক ও প্রীতিময়। তাদের জীবন-যন্ত্রণা থেকেই জগত ও জীবনকে অনুধাবন করার মানসিকতা কবির হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাইতো তিনিই বলতে পেরেছিলেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।···
···প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ('মুক্তি')

সাধারণ জন-জীবনের অসংখ্য সমস্যা, অসংখ্য জটিলতার মর্ম ভেদ করেই কবি জগতকে জানার ও আত্মোপলব্ধির আনন্দ পেতে চান। সেই সব সমস্যাকে এড়িয়ে নয়, নইলে কি তিনি বলতে পারতেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। ('প্রাণ')

মানুষের জীবন-যন্ত্রনার মধ্যে একাত্ম (নিমগ্ন) হওয়ার এই মানবিক অনুভূতিতেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণের কবি' হয়ে উঠেছেন, পরিণত হয়েছেন 'জন-গণ-মন-অধিনায়কে'।

একথা ঠিক যে কবি প্রথম জীবনে ঠাকুর পরিবারের বৈভব ও আভিজাত্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। ফলে সাধারণ জন-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটনের কঠোর বাস্তবতার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে তাঁর এই সময়ের কবিতায় সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন-যাত্রার উপস্থিতির অভাব লক্ষ্য করা যায়, লক্ষ্য করা যায় জীবন-যন্ত্রণার জটিল বাস্তবতার অনুপস্থিতিও। বরং এর পরিবর্তে সুখী জীবনের উচ্ছাস, কল্পনাময়তা ও রোম্যান্সপ্রিয়তা তাঁর কবিতায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে কবি যখন বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হতে লাগলেন, বিশেষ করে নব-যৌবনে জমিদারীর কাজে যখন গ্রাম-বাংলায় চলে এলেন তখন থেকেই তিনি

সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে লাগলেন। এবং এর ফলেই কবির কবিতায় জীবনের উচ্ছাস ও রোমাণ্টিকতার পাশাপাশি জীবনের কঠোর বাস্তবতা ও জীবন-জটিলতাও মুদ্রিত হতে থাকে। জন-জীবনের সংস্পর্শে এসে কবি বুঝতে পেরেছিলেন যে দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, শ্রমজীবী, খেটে খাওয়া মানুষেরাই সমাজের পিলসুজ্, এবং তাদের শ্রমের মূল্যেই ধনী-বাবুদের সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। তাইতো কবি এবার উচ্ছাসভরা সুখী-জীবনের ইতিকথা রচনা থেকে সরে আসতে চেয়েছেন, এতদিনকার কল্পনাবিলাসী রোম্যান্সের ঘোর কাটিয়ে মুক্ত বাস্তবতায় ফিরে আসতে চেয়েছেন। তাইতো তিনি সখেদে বলেছেন—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে—
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়োনা সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়।
... ...
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নতুনতর ; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল। ('এবার ফিরাও মোরে')

বাস্তব জগত-সংসারের সাথে, সাধারণ জন-জীবনের কঠোর বাস্তবতার সাথে একাত্ম হওয়ার 'ক্ষুধানল' জ্বলে ওঠায় কবি এবার আভিজাত্যের উচ্চাসন থেকে পথের ধুলোয় নেমে এসেছেন, তাই লিখেছেন তিনি—

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসর-প্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।—কোথা যাও, পান্থ কোথা যাও?
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও!
('এবার ফিরাও মোরে')

হ্যাঁ, কবি এবার সুস্থ, নিরাপদ জীবনের পরিমণ্ডল থেকে বিপন্ন 'জনতার মাঝখানে' এসে দাঁড়িয়েছেন। সাধারণ জন-জীবনের ইতি-কথা জানার অদম্য আগ্রহে সহপথযাত্রীদের সাথে ডেকে ডেকে পরিচয় করছেন। জীবন-যন্ত্রণার স্বরূপ অনুভব করতে পারছেন তাই তিনি এবার। তাইতো তাঁর কবিতায় এবার জীবন-যন্ত্রণার উল্লেখ পাওয়া যেতে লাগল, সাধারণ মানুষের কথা শোনা যেতে লাগল ব্যাপকভাবে।

শুধু সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য তুলে ধরেই কবি ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি হতভাগ্য, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের মুক্তি-পথের সন্ধানেও ব্রতী হলেন এবার। শোযিত, বঞ্চিত মানুষেরা যাতে জীবনের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায় এবং শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয় এ জন্য কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় শোষণ-বঞ্চনার করাল ও ভয়াল রূপ তুলে ধরে শোষণ সম্পর্কে তাদের সজাগ ও সচেতন করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন কবিতায় বিদ্রোহ আর বিক্ষোভের ছবি এঁকে শোষিত, সর্বহারা মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে নিজেদের বিপর্যস্ত ভাগ্যকে নতুন করে গড়ে নেওয়ার আশা-ভরসা দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ তথা সুবিধাবাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন দৃঢ় মানসিকতা তুলে ধরেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এদের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত গড়ে তুলে এদের উদ্ধত গতিকে প্রতিহত করা। সাধারণ মানুষের উপর ধন-সম্পদের গর্বে উদ্ধত সুবিধাবাদী ধনীর শাসন-শোষণের উদ্দামতাকে দমন করার কথাও তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় জোরালোভাবে প্রচার করেছেন। মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ধনীর শোষণ-পীড়নই তার নিজের পতনের পথ তৈরী করে,[১৩৬] কারণ শোষিত মানুষ অবশেষে রুখে দাঁড়িয়ে ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেবেই। তাই যারা আজ ক্ষমতার মোহে মদ-মত্ত হয়ে উঠে শোষণ-পীড়ন চালাচ্ছে, তাদেরও অনুরূপ শোষণের সম্মুখীন হতে হবে, অনুরূপ বঞ্চনার সামিল হতে হবে—এটাই কবি মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর মতো গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, নইলে কি আর তিনি বলতে পারতেন—

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছে যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

... ...

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে
... অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান

('অপমানিত')

শোষিতের অভিশাপ ও তার বিদ্রোহেই যে শোষকের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী তা কবি আরো স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে শোষককে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—

দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।

('অপমানিত')

কবি তাই শোষিতকেই শোষকের 'মৃত্যুদূত বলে চিহ্নিত করেছেন। কবির এই বিশ্বাস 'সাম্যবাদী ইস্তাহারে' মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর সেই স্মরণীয় বক্তব্যটির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, যে বক্তব্যটিতে তাঁরা বলেছেন—

> বুর্জোয়ারা শুধু নিজেদের কবর খননকারীদেরই সৃষ্টি করে। তাদের পতন ও সর্বহারার বিজয় তাই সমান-ভাবেই অবধারিত।
>
> [What the bourgeoisie, therefore, produces, above all, is its own grave-diggers. Its fall and the victory of the proletariat are equally inevitable.][১৩৭]

সুতরাং বুর্জোয়াদের শাসন-শোষণ, তাদের সীমাহীন স্বৈরাচারী আধিপত্য, শোষিত সর্বহারাদের বিদ্রোহে তাদের পতন ও সর্বহারাদের বিজয় প্রভৃতি ধ্যান-ধারনার ক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ ও

মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর চিন্তাধারার মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই সমন্বয় বা সাদৃশ্যটিই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কবি রবীন্দ্রনাথকে সাম্যবাদী মনের কবি হিসাবে চিহ্নিত না করেই পারা যায় না। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে যে তিনি হলেন একজন মার্ক্সীয় চিন্তাধারার বা মার্ক্সবাদী দর্শনের কবি। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ রাজনৈতিক চিন্তার জগতে যে সমাজতন্ত্রী জীবনধারা প্রবর্তন করার কথা বলেছিলেন, কবিও তাঁর কাব্য রচনার অনেক ক্ষেত্রেই সেই ধারা অনুসরণ করেছিলেন; কারণ কবির ভাবনা-চিন্তা ও কার্য-কলাপে মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি একদিকে যেমন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দৃঢ় মানসিকতা তাঁর বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ করে কবিতা রচনায় তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে শোষিত-বঞ্চিত মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাক—এটাও তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছেন ও তা' জোরালোভাবে প্রচার করেছেন।

আসলে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ-বিচারটাই সমাজের পক্ষে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অথচ পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল ধনী-দরিদ্রের এই প্রভেদ। সমাজে মানুষে মানুষে ধন-বৈষম্য থাকলে ধনী মানুষেরা ধন-সম্পদের গরিমায় দরিদ্রকে অবহেলা করে, তার প্রতি অবিচার চালায়। আর্থিক সংগতির দাপটে তারা সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করে এবং সাধারণ জনগণের উপর চালায় নিজেদের সীমাহীন স্বেচ্ছাচার। সে-স্বেচ্ছাচারের বিভীষিকায় সমস্ত সমাজ তখন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তখন 'গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে' মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, 'দুঃস্বপনের তলে' লুপ্ত হয়ে যায় শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর 'ভুবন', তখন অসহায়, অশক্ত জন-জীবন ত্রাসে-সন্ত্রাসে 'উন্মাদ হয়ে ছোটে' ('প্রশ্ন') সুস্থভাবে একটু বাঁচার মতো পরিবেশের খোঁজে। প্রকৃত পক্ষে, স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতালিপ্সু গুটি কয়েক মানুষের শোষণ ও

অপশাসনের দাপটে সত্যিই 'বিচারের বানী নিরবে নিভৃতে কাঁদে', অন্যায় অবিচার তখন ছেয়ে যায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কিন্তু কবি মনে করেন ধনী ও আত্মম্ভরী মানুষের দাপটকে বজায় থাকতে দেওয়া সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। বরং তাদের অন্যায়-অবিচার আর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যখন চরম হয়ে ওঠে, তখন 'পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে' না ম'রে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। তবেই তো বিষাক্ত ও দূষিত সমাজ দূষণহীন ও বিষমুক্ত হবে, তখনই তো সাধারণ জনগণ সুস্থ জীবনের নিরাপত্তা পাবে, বাঁচার মতো শোষণহীন সুস্থ ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ ফিরে পাবে, নতুন ক'রে গড়ে নিতে পারবে নিজেদের বঞ্চিত ভাগ্যকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ বা সমবেত বিক্ষোভ সংগঠনের আবশ্যকতার ধারণাতেও কবি সমান বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরীভূত হয়ে সুস্থ-সুন্দর, পূর্ণাঙ্গ, নিশ্চিন্ত, নির্ভয় সমাজ গড়ে উঠুক এবং সমাজ হয়ে উঠুক কলুষমুক্ত ও সকলের বাসযোগ্য—এই আশ্বাসও কবি পোষণ করেছেন। কবির কল্পিত ভবিষ্যতের সেই মানবিকতায় ভরপুর, সুস্থ, সুখী, সমতাভিত্তিক, নিরাপদ সমাজটি হবে এমনই একটা মানব-সমাজ, যেটির ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

চিত্ত যেথা ভয়শূণ্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
… …
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা,…। ('প্রার্থনা')

কবি-কল্পিত সুস্থ, নিরাপদ, সমতামূলক, ক্ষুদ্রতা-নীচতাহীন, প্রথাসর্বস্বতাহীন, ন্যায়বিচার-সম্পন্ন, পৌরুষের সমতামণ্ডিত এই যে ভাবী মানব সমাজ, সে-সমাজ যে মার্ক্স-এঙ্গেলস্‌-এর প্রচারিত বিপ্লবোত্তর সমাজবাদী সমাজেরই হুবহু প্রতিরূপ তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ তাঁদের ধারণা অনুযায়ী সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের পথ ধরে

যে সমাজবাদী সমাজ গড়ে ওঠে সেখানেও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে সামাজীকীকৃত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে, শোষণের গতি তাই রুদ্ধ হয় সেখানে, সেখানে মানুষ হয় স্বাধীন ও নিশ্চিন্ত, ন্যায় বিচার হয় ত্বরান্বিত, জীবনের সমতার ভিত্তি হয় সুদৃঢ়। এই ধরণের সমতাভিত্তিক, সুস্থ, নিরাপদ সমাজের কল্পনার দিক থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ ও মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর চিন্তাধারার মধ্যে এক মহা সমন্বয় ঘটেছে। এদিক থেকেও কবিকে সমাজবাদী মনের কবি বলে চিহ্নিত করা যেতেই পারে; তবে তাঁকে পুরোপুরি মার্ক্সবাদী কবি বলে চিহ্নিত করা যায় কিনা—সেটি অন্য কথা। বলাই বাহুল্য যে, মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর চিন্তাধারার প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিই রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে উল্লেখযোগ্যভাবেই বিদ্যমান ছিল; এবং তিনি তাঁর বক্তব্যে, তাঁর সাহিত্যে সেগুলির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।[১৩৯] এই কারণেই তাঁকে আমরা মার্ক্সবাদী দর্শনের বা মার্ক্সীয় চিন্তাধারার অনুসারী কবি বলে চিহ্নিত করতেই পারি। তদ্‌সত্বেও "রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদী ছিলেন একথা ঘুনাক্ষরে কেউ কোনদিন বলবে না। আবার একথাও ঠিক যে ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি যুক্ত থাকেন নি সব সময়। তবে একথাও ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্ক্সবাদীরা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং অকপট বস্তুনিষ্ঠ মননশীলতার দৌলতে বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেখা গিয়েছে। কারণ, নানান বৈপরীত্য ও মতাদর্শগত বিভিন্নতা থাকা সত্বেও তাঁর ঠাঁই বিশ্বের মেহনতী মানুষের এই সংগ্রামী শিবিরেই।"[১৪০]

উপরি উক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কবি রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কবি ছিলেন না, ছিলেন মানুষের কবি, মানবতার কবি, উদার মনের দরদী কবি, ছিলেন ভেদাভেদ দূর ক'রে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী কবি, ছিলেন মানুষের সাথে মানুষের সংহতি স্থাপনের, মৈত্রী রচনার ও মমতা জাগরণের সজাগ কবি। এক কথায়, তিনি ছিলেন জগত ও জীবনের হৃদয়বান কবি। 'বুর্জোয়া কবি' বলে তাঁকে চিহ্নিত করার ব্যাপারটি তাই অতি সরলীকরণ মাত্র (over-simplification) বলেই মনে হয়।

তথ্য ও প্রসঙ্গ নির্দেশিকা

[১] **মার্ক্সীয় শব্দতত্ত্ব** :—'মার্ক্সীয় শব্দতত্ত্ব' না বলে বরং 'মার্ক্সীয় শব্দ-ভাণ্ডার' বলাই শ্রেয়। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শব্দ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবোধক হয়ে উঠেছে, সেই সমস্ত শব্দকে নিয়ে 'মার্ক্সীয় শব্দভাণ্ডার' গড়ে উঠেছে, যেমন 'বিপ্লব' একটি শব্দ। এই শব্দটি মার্ক্সীয় চিন্তাধারা গড়ে ওঠার পূর্বেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু মার্ক্সের বিশ্লেষণেই এই 'বিপ্লব' কথাটি বেশ জোরালো ও বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

[২] **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** :—প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া ভালো।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের (Historical Materialism) মূল কথা হল মানব সমাজের ইতিহাসকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা। বস্তুবাদ বলতে বোঝায় এই জগত বস্তুময় ; বস্তুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই পরিদৃশ্যমান জগত। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্বের উপরই জগতের ধারণা দাঁড়িয়ে আছে। তাই বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তু আগে, মন বা মানসিক ধারণা পরে। এই বস্তু জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই রয়েছে দুটি পরস্পর বিরোধী প্রবণতা : সদর্থক (Thesis) ও নঞর্থক (Anti-thesis) ; এদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলেই বস্তুর তথা বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটে, যা সর্বদায় গুণগত (Qualitative)। এই গুণগত পরিবর্তনমূলক অবস্থাই হল সুষম অবস্থা বা সমন্বয়-সূচক অবস্থা (Synthesis) এটাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism) মূল কথা। আর এই বস্তুবাদের ভিত্তিতে মানব সমাজের ইতিহাসের বিশ্লেষণই হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, মানব সমাজের ভিত্তি (base) হল অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থা ; এই অর্থব্যবস্থাকে কেন্দ্র

করেই গড়ে উঠেছে রাজনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি **উপরি কাঠামো** (super-structures)। অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থা বলতে মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থাকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা নিয়েই সমাজে দুটো শ্রেণীর (class) সৃষ্টি হয়: এর মালিক শ্রেণী ও এর মালিকানাহীন শ্রেণী। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথা হল এই যে অর্থব্যবস্থার মালিকানা যতদিন পর্যন্ত কোন একটি শ্রেণীর হাতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এর মালিক ও মালিকানাহীন শ্রেণীদুটির মধ্যে **শ্রেণী-সংগ্রাম** (Class-struggle) অনিবার্য। এই শ্রেণী-সংগ্রাম যতদিন থাকবে ততদিন সমাজের পরিবর্তন আসবেই। তাই শ্রেণী সংগ্রামের পথ ধরেই ইতিহাসের (অতীতের) দাসযুগ ও সামন্ত যুগের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এসেছে পুঁজিবাদী যুগ। এই যুগেও বুর্জোয়া মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই যুগের অবসান ঘটবে, প্রতিষ্ঠিত হবে **সর্বহারার একনায়কতন্ত্র** (Dictatorship of the proletariat) বা **সমাজতন্ত্র** (socialism)। সমাজতন্ত্রে অর্থব্যবস্থার মালিকানা যেহেতু সমগ্র সমাজের হাতে থাকবে, সেহেতু এর ব্যক্তিগত মালিক ও মালিকানাহীন শ্রেণীদুটির অস্তিত্ব এখানে থাকবে না, ফলে থাকবে না **শ্রেণী-সংগ্রাম**। এবং এবারই এক সুস্থ, সুখী, সাম্যবাদী ও মানবিক সমাজের ভিত্তি রচিত হবে। এইভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে মানব-সমাজের ইতিহাসের বিশ্লেষণে প্রয়োগ ক'রে শ্রেণী বৈষম্যমূলক অতীত ও বর্তমান কালের মানব সমাজের ভবিষ্যতের **সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী** সমাজে রূপান্তরের কথা বলে।

মোটামুটিভাবে এটাই হল মার্ক্সীয় **ঐতিহাসিক বস্তুবাদের** মূলকথা।

[৩] **K. Marx and F. Engels, Manifesto of the Communist Party, Progress Publishers, Moscow, 1975, p.41**

[৪] তদেব।

[৫] তদেব।

[৬] তদেব।

[৭] তদেব, পৃঃ ৪০। বুর্জোয়া ও সর্বহারা সংক্রান্ত এঙ্গেলস-এর এই অভিমত জার্মান ভাষায় লিখিত সাম্যবাদী ইস্তাহার গ্রন্থের ১৮৮৮ সালের ইংরাজী অনুবাদ (Manifesto of the Communist Manifesto) গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

[৮] তদেব, পৃঃ ৪৪-৫। মূল বক্তব্যটি হল যথা :—

> "The bourgeoisie···has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations. It···has left remaining no other nexus between man and man than naked self-interest, than callous "cash payment."···It has resolved personal worth into exchange value, and has set up···Free Trade. In one word···it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploitation···It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage-labourers. The bourgeoisie has torn away from the family its sentimental veil, and has reduced the family relation to a mere money relation."

[৯] বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্বেকার শাসকশ্রেণীগুলি মার্ক্সবাদী ধারণা অনুযায়ী মূলতঃ হল দাস মালিক ও সামন্তপ্রভু শ্রেণী। কার্ল মার্ক্স মানব সমাজ বিকাশের যে স্তরগুলির কথা বলেছেন সেগুলি হল : (১) আদিম সাম্যবাদী যুগ, (২) দাস যুগ, (৩) সামন্ত যুগ, (৪) পুঁজিবাদী যুগ এবং (৫) সমাজবাদী যুগ। আদিম সাম্যবাদী যুগে বলাই বাহুল্য কোন শ্রেণী বৈষম্য ছিল না; সেখানকার অতি প্রাচীন রীতির উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সেই সময় কারোরই কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। ফলে মালিক শ্রেণী ও মালিকানাহীন শ্রেণী এই পরস্পর বিবদমান শ্রেণী দুটির কোন

অস্তিত্ব সেখানে ছিল না, ছিল একটিই মাত্র শ্রেণী—যা হল মানুষ শ্রেণী। কিন্তু দাসযুগে কিছু মানুষ যখন গায়ের জোরে অর্থাৎ বাহুবলে জমি-জায়গা দখল করে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর মালিকানা বা আধিপত্য ভোগ করতে শুরু করল, তখন তারা সম্পত্তিবান বা মালিক শ্রেণীতে পরিণত হ'ল; আর দুর্বল, অ-শক্ত, অক্ষমেরা তাদের দাসে পরিণত হল। মালিকেরা নিজেদের লাভের স্বার্থে দাসদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার করতে লাগল। তাই অত্যাচারিত দাসেরা অবশেষে বিদ্রোহ ক'রে দাসযুগের পরিবর্তন সাধন করে, এবং এরই ফলে সূচিত হয় সামন্তযুগ। এই যুগেও শ্রেণী বৈষম্য ও শোষণ-শাসন রয়ে গেল। আগেকার শোষক দাস-মালিক শ্রেণীটির পরিবর্তে এবার এল সামন্তপ্রভু শ্রেণী; এই শ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা দখল করে সামন্ত প্রজা বা ভূমি-দাস-শ্রেণীর উপর শোষণ-পীড়ন চালাতে থাকে। শোষণে জর্জরিত সামন্ত প্রজারা মরীয়া হয়ে অবশেষে বিদ্রোহ করে সামন্ত প্রভুদের পরাস্ত করে; ফলে উদ্ভব ঘটে পুঁজিবাদী যুগের। আর এই পুঁজিবাদী যুগে উৎপাদন ব্যবস্থাব মালিকানা ভোগ করে বুর্জোয়া শ্রেণীটি। তাই সে তার মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে। মার্ক্সের বিশ্বাস, শ্রমিকরা বিপ্লব ক'রে বুর্জোয়াদের পতন ঘটিয়ে সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। সে যাই হোক, এখানে যে কথা বলা প্রয়োজন তা হল এই যে আধুনিক পুঁজিবাদী যুগের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর আগে দাসযুগে দাস মালিক শ্রেণী ও সামন্তযুগে সামন্তপ্রভু শ্রেণীই ছিল শাসক ও শোষক শ্রেণী।

[১০] Marx and Engels, (Manifesto of 'the Communist Party, p. 48। মূল বক্তব্যটি হল যথা :—

"The bourgeoisie keeps more and more doing away with the scattered state of the population, of the means of production, and of

property. It has agglomerated population, centrelised means of production, and has concentrated property in a few hands · The bourgeoisie, during its rule, has created more massive and more colossal productive forces than have all preceding generations together."

[১১] তদেব, পৃ ৪৫—৬। মূল বক্তব্যটি হল যথা :—

"The bourgeoisie can not exist without constantly revolutionising the instruments of production and thereby the relations of production, and with them the whole relations of society. Conservation of the old modes of production in unaltered form, was, on the contrary, the first condition of existence for all earlier industrial classes. Constant revolutionsing of production, uninterrupted disturbance of of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones."

[১২] তদানীন্তন কালে সামাজিক খ্যাতির শীর্ষে আরোহণকারী ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগী ও দক্ষতা-সম্পন্ন সদস্য ও সদস্যাগণের একটা মোটামুটি তালিকা এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সংগীত-অনুরাগী ও সাহিত্য-রসিক ছিলেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন পরম সংগীত-প্রাণ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও গুনগ্রাহী। কবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সংগীত ও সাহিত্য চর্চ্চার অনুরাগী। তাঁর দিদিরা যথা স্বপ্রভাদেবী, সরলাদেবী প্রমুখা অভিনয় ও সংগীতে পারদর্শিনী

ছিলেন। ছোটদিদি স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যানুরাগী ছিলেন ও মহিলা কবি হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় ও চিত্রকলাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয়, সংগীত ও ললিতকলায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। স্বরূপাদেবী (অবনীন্দ্রনাথের কন্যা) অভিনয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইন্দিরাদেবী (কবির ভাতুস্পুত্রী) সাহিত্য ও সংগীতে অনুরাগী ছিলেন। প্রতিভাদেবী (কবির ভাতুস্পুত্রী) অভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবির পুত্র) সাহিত্য ও অভিনয়ে অনুরক্ত ছিলেন। রমাদেবী ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি ও দাদা) যথাক্রমে সাহিত্য এবং সংগীত ও অভিনয়ে অনুরাগী ছিলেন। এই রকমভাবে ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা, অনুরাগ ও আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

[১৩] অবশ্য 'এলিট' বলতে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত চক্রবর্তী সমাজের সব দিক থেকে এগিয়ে থাকা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীকেই বুঝিয়েছেন। তার কথায়, "এলিট বলতে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষকেই চিহ্নিত করা হয় যারা সর্বদায় (সমাজের) সুবিধা পেয়ে থাকে।" [বন্ধনী আমাদের কৃত] ("Elite connotes a particular class of people who always get the loaves and fishes.") এই উদ্ধৃতিটির জন্য R. Chakrabarty, Book Review of Subaltean Studies II, ed. by R. Guha, in Society and Change, Vol. IV, No. 1., ed. by Buddhadeva Bhattacharyya, p. 65 দ্রষ্টব্য।

আবার 'এলিট' শব্দের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ সংজ্ঞা দিয়েছেন শ্রীযুক্ত রণজিত গুহ। তাঁর মতে, এলিট হল "গুরুত্বপূর্ণ বৃহত্তম সামন্ত-ব্যক্তি-সমূহের এবং শিল্পীয় ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের" গোষ্ঠী। (The word 'elite indicates the group of "the biggest feudal magnets, the most important representatives of

the industrial and mercantile bourgeoisie." এই উদ্ধৃতিটির জন্য R. Guha, (ed.) Subaltern Studies, Vol. 1, p 8. দ্রষ্টব্য।

এক কথায়, আধুনিক শিল্পীয় সমাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর, সুবিধাপ্রাপ্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও আলোকপ্রাপ্ত, মানুষের সম্মিলিত এককই (Unit) হল এলিট। **এই অর্থেই ঠাকুর পরিবারটি একটি এলিট বা উৎকৃষ্ট পরিবার, স্বার্থান্ধ বুর্জোয়া পরিবার নয়।**

[১৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনী। এটি কবির আত্মজীবনীমূলক ও পারিবারিক ইতিকথায় সমৃদ্ধ তার একটি বিখ্যাত রচনা।

[১৫] শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্প'। এই প্রবন্ধটির জন্য শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত **রবীন্দ্র স্মৃতি** গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬১ (১৩৬৮), পৃঃ ১৭০।

[১৬] তদেব।

[১৭] ক্ষিতীশ রায় (অনুবাদিত কৃষ্ণ কৃপালনী রচিত), **দ্বারকানাথ ঠাকুর ঃ বিস্মৃত পথীকৃত**, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, দিল্লী, ১৯৮৪, পৃঃ ৯১।

[১৮] তদেব, পৃঃ ১৯১-৫।

[১৯] কাজী আবদুল ওদুদ, **কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ** (প্রথম খণ্ড), ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃঃ ৫।

[২০] অসিত কুমার হালদার, 'সাবেকী কথা,' **রবীন্দ্র স্মৃতি**, পৃঃ ১২৮। আরো দ্রষ্টব্য আবদুল ওদুদ, **কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ**, পৃঃ ৬।

[২১] তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ প্রত্যেক জমিদারীতেই নায়েব পেয়াদা গোমস্তাদের জুলুম চলেই থাকে; এই ঘটনা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারীতে ঘটলেও ঘটে থাকতে পারে, তবে আমরা তেমন ঘটনা পাইনি; এদিকেও আমরা লক্ষ্য রাখছি।

[২২] রমাকান্ত চক্রবর্তী, তদেব, পৃঃ ৬৬।

[২৩] আবদুল ওদুদ, তদেব, পৃঃ ৬।

[২৪] তদেব। এবং তৎসহ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব পৃঃ ১৭০।

[২৫] অসিত কুমার হালদার, তদেব, পৃঃ ১২৮। উদ্ধৃত অংশে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধনী রেখা আমরা চিহ্নিত করেছি ; তৃতীয় বন্ধনী মূল লেখক কর্তৃক চিহ্নিত।

[২৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবন স্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৫৭।

[২৭] তদেব, পৃঃ ৬১-২।

[২৮] তদেব, পৃঃ ৬১।

[২৯] শ্রী শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবত রত্ন, ধ্যানযোগ : তত্ত্ব ও সাধন, প্রতিভা কুটীর, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৩৬-৭।

[৩০] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উদ্ধৃতিটি শ্রী শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবত রত্নের উপরি উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৪-৫।

[৩১] শ্রী শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবত রত্ন, তদেব, পৃ. ৩৭।

[৩২] ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের ধ্যান-নিমগ্নতা বিষয়ক উদ্ধৃতিটি শ্রী শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবত রত্নের উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৮। উদ্ধৃতিটির বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত।

[৩৩] শ্রী শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবত রত্নের উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৬-৭।

[৩৪] প্রকৃত সৎ ও সাধু মানুষের মনে শোষণ-পীড়নেরবাসনা জাগতে পারে না, যেমন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানসিকতায় শোষণ-কামী প্রবণতার কোনও চিহ্ন ছিল না, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তুল্যমূল্যে বিচার করার মানসিকতা আমাদের নেই। তবে বকধার্মিক ভণ্ডতপস্বীর ক্ষেত্রে সবই সম্ভব ; তারা লোক দেখানো পূজা-অর্চনাও করে, আবার লোকচক্ষুর আড়ালে অবৈধ ও অস্বীকৃত কাজও করে।

[৩৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবন স্মৃতি, পৃঃ ৫৮।

[৩৬] অসিত কুমার হালদার, তদেব, পৃঃ ১২৭-৮।

[৩৭] সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃঃ ২৯।

[৩৮] আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই-এর এই বক্তব্যটি শ্রী শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবত রত্নের উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৪-৫।

[৩৯] তদেব, পৃঃ ৪৫-৬।

[৪০] শ্রী শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবত রত্নের উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫।

[৪০] ৭ই পৌষ দিনটি ছিল মহর্ষিদেবের দীক্ষার দিন। ৪৮ বছর আগে (১২৯৮ সাল থেকে ধরে) এই দিনে অর্থাৎ ১২৪৮ সালের ৭ই পৌষ তিনি দীক্ষা লাভ করেন।

[৪১] সাধনা কর, '৭ই পৌষ', রবীন্দ্র স্মৃতি, পৃঃ ১০৬-৭।

[৪২] তদেব, পৃঃ ১০৭-৮।

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন, নাম বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তবে তিনি শৈশবেই স্বর্গত হন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠতম পুত্র বলা হল।

এ প্রসঙ্গের জন্য কবির জীবন স্মৃতি গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত ঠাকুর পরিবারে বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য। আরো দ্রষ্টব্য অসিত কুমার হালদার, তদেব, পৃঃ ১২৪।

[৪৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবন স্মৃতি, পৃঃ ১৩-৪।

[৪৫] তদেব, পৃঃ ১৪-৬।

[৪৬] বুর্জোয়া চরিত্রের মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আগেই (৭ নং প্রসঙ্গ থেকে ১১ নং প্রসঙ্গের মধ্যেকার বক্তব্যে) সবিশেষ আলোচনা করেছি। এদিক থেকে সেই আলোচনার শেষ অংশটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এখানে বুর্জোয়া মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সার্বিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

[৪৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবন স্মৃতি, পৃঃ ১৭।

[৪৮] তদেব, পৃঃ ৬১।

[৪৯] তদেব।

[৫০] মহর্ষিদেবের সন্তান-সন্ততিগণের উপর তাঁর নিজের পরিচর্যার অবকাশ না থাকার ব্যাপারটিই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষোভের কারণ, যেহেতু তিনি অনেকটা আক্ষেপের ভঙ্গীতেই লিখেছেন—

"আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়।"

দ্রষ্টব্য জীবন স্মৃতি, পৃঃ ৪৬।

[৫১] রবীন্দ্রনাথে মাতা সারদাদেবীর ২৫ বছরের ব্যবধানে ১৫টি সন্তান প্রসবের ঘটনাটি কবির **জীবন স্মৃতি** গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত বংশ তালিকা থেকে সংগৃহীত।

[৫২] আবদুল ওদুদ, তদেব, পৃঃ ১০।

[৫৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **জীবন স্মৃতি**, পৃঃ ২১-২।

[৫৪] গীতা মুখোপাধ্যায়, 'প্রজাদের সঙ্গে', **রবীন্দ্র স্মৃতি**, পৃঃ ৮৯।

[৫৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী মশাই-এর **রায়তের কথা** গ্রন্থের 'ভূমিকা'। দ্রষ্টব্য **রায়তের কথা**, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫১, পৃঃ ৭-৮।

[৫৬] তদেব, পৃঃ, ৭, ৮, ১০ ও ১১।

[৫৭] তদেব, পৃঃ ৮।

[৫৯] সুজন চক্রবর্তী, 'তীর্থদর্শন—উত্তরণের একটি পর্যায়'-এ উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য নির্মল পোদ্দার সম্পাদিত **ছাত্র সংগ্রাম** (বিশেষ সংখ্যা) কলিকাতা, মে—১৯৮৬, পৃঃ ১৭।

[৬০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **রায়তের কথা**-র 'ভূমিকা' পৃঃ ৮।

[৬১] তদেব।

[৬২] কবির এই বক্তব্যটি আবদুল ওদুদ মশাই-এর **কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ** গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৩০-১।

[৬৩] দ্রষ্টব্য শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, **সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ**। এই গ্রন্থে প্রজাদের সাথে রবীন্দ্রনাথের মেলা-মেশা বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনা উল্লিখিত আছে। 'পুন্যাহ উৎসবের' গল্পটি এমনই একটি ঘটনা।

[৬৪] জমিদার-কবির সাথে শিরোমণি চক্রবর্তী মশাই-এর সাক্ষাৎকারের কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাটি শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মশাই-এর উক্ত গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

[৬৫] 'পুন্যাহ উৎসব' ও 'শিরোমণি চক্রবর্তী মশাই' সংক্রান্ত ঘটনা দুটির বিশ্লেষণের জন্য আমরা গীতা মুখোপাধ্যায়ের 'প্রজাদের সঙ্গে' প্রবন্ধটির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। দ্রষ্টব্য গীতা মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ৯০-৪।

[৬৬] দ্রষ্টব্য শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, তদেব।

[৬৭] রবীন্দ্র-জীবনী অনুশীলনে আমরা এমন কোন ঘটনা পাইনি যে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে তাঁর জমিদারির প্রজারা উৎপীড়িত হয়েছে, অথবা তিনি জমিদারিতে অন্যায়-অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তবে তাঁর জমিদারিতে খাজনা আদায়ে, উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপারে নায়েব-পেয়াদার স্বভাবসুলভ অবিচার প্রজাদের ক্ষেত্রবিশেষ সহ্য হয়ত করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই অবিচারের কাহিনী কবির গোচরে এলে তিনি তাঁর সাধ্যমতো এর প্রতিকারের চেষ্টাও করেছেন।

[৬৮] গীতা মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ৯৪।

[৬৯] প্রথম চৌধুরী, রায়তের কথা, পৃঃ ১৯।

[৭০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায়তের কথা-র ভূমিকা। দ্রষ্টব্য প্রমথ চৌধুরী, তদেব, পৃঃ ৯-১০। বন্ধনীবদ্ধ অংশ ও আয়ত অক্ষর মুদ্রন আমাদের।

[৭০] [ক] দুলাল চৌধুরী কর্তৃক 'রবীন্দ্রনাথের গ্রাম' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য সুভাষ চক্রবর্তী সম্পাদিত যুব মানস (রবীন্দ্র সংখ্যা) মে ১৯৮৬, কলিকাতা, পৃঃ ৯৯।

[খ] দুলাল চৌধুরী, তদেব।

[গ] তদেব।

[৭১] হেমেন্দ্র কুমার রায়, 'নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্র স্মৃতি, পৃঃ ১৯৩।

[৭২] আলোকিত বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য R. P. Dutt, India Today, Manisha, Calcutta, 1970, pp. 338-9।

[৭৩] দ্রষ্টব্য শুভেন্দু ঘোষ, 'ভারত আত্মার বাণীমূর্তি' রবীন্দ্র স্মৃতি, পৃঃ ২০৭।

[৭৪] কবির পত্রের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য শুভেন্দু ঘোষ, তদেব, পৃঃ ২০৮-৯।

[৭৫] কবির ভাষণের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য দেবাশিস্ চক্রবর্তী ও প্রত্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য', ছাত্র সংগ্রাম, পৃঃ ২৪। আয়ত অক্ষর মুদ্রণ আমাদের।

[৭৬] প্রভাত চন্দ্রগুপ্ত, 'মা নিষাদ', রবীন্দ্র স্মৃতি, পৃঃ ৯৬-৭।

[৭৭] মনোজ বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজগৎ', রবীন্দ্র স্মৃতি, পৃঃ ৩০০।

[৭৮] দ্রষ্টব্য জয়ন্ত কুমার রায় ও প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, আন্তর্জাতিক

সম্পর্কের ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৫ ; পৃঃ ১৫৪।

[৭৯] কবির এই বক্তব্যটির জন্য দ্রষ্টব্য মইনুল হাসান, 'রবীন্দ্রনাথ : এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব', ছাত্র সংগ্রাম, পৃঃ ১৩-৪। ব্যক্তব্যটির বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত।

[৮০] এই ব্যক্তব্যটির জন্য মইনুল হাসান, তদেব, পৃঃ ১৪।

[৮১] কবির পত্রের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য নীলরতন সেন, 'রবীন্দ্র ও গান্ধীজি', রবীন্দ্র স্মৃতি, পৃঃ ৩০৮।

[৮২] কবির এই বক্তব্যটির জন্য দ্রষ্টব্য শুভেন্দু ঘোষ, তদেব, পৃঃ ২০৬।

[৮৩] মনোজ বসু, তদেব, পৃঃ ৩০১।

[৮৪] কবির পত্রের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য মনোজ বসু, তদেব, পৃঃ ৪০০-১।

[৮৫] দ্রষ্টব্য সাধনা কর, তদেব, পৃঃ ১০৬।

[৮৬] তদেব, পৃঃ ১০৭।

[৮৭] তদেব, পৃঃ ১০৮।

[৮৮] কবির শান্তিনিকেতনের মেলা সম্পর্কিত এই বক্তব্যটি সাধনা কর কর্তৃক উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য সাধনা কর, তদেব।

[৮৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কালান্তর' পর্যায়ে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৪১০।

(৯০) Marx and Engels, **Manifesto** of the Communist Party, p. 96. বন্ধনীভুক্ত অংশ আমাদের।

(৯১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট', পৃঃ ৪১০।

(৯২) Marx and Engels, Manifesto of the Communist Party, p. 40.

(৯৩) কবির 'সুধিয়া ও 'মাধো' কবিতা দুটির জন্য রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ডের (কাব্য) 'ছড়ার ছবি' অংশ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫১৫-২০। 'সুধিয়া' ও 'মাধো' কবিতা দুটির সারমর্ম বিশ্লেষণের জন্য আমরা গিরীণ চক্রবর্তী মশাই-এর 'শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটির কাছে ঋণী। দ্রষ্টব্য. গিরীন চক্রবর্তীর উক্ত প্রবন্ধ, রবীন্দ্র স্মৃতি, পৃঃ ২৯৩-৫।

(৯৪) গিরীন চক্রবর্তী, তদেব, পৃঃ ২৯৪।

(৯৪) (ক) শ্রীমন্ত কুমার জানা, রবীন্দ্র মনন, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৫০।

(৯৫) 'বিচারক' কবিতাটির বিশ্লেষণের জন্য আমরা আবদুল ওদুদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে কৃত আলোচনার কাছে ঋণী ; পৃঃ ৪৪৬-৭।

(৯৬) কবির 'রাশিয়ার চিঠি'র (তৃতীয়পত্র)। এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীমন্ত কুমার জানা, তদেব, পৃঃ ১৫০। বন্ধনীবদ্ধ অংশ আমাদের।

(৯৭) কবির এই উক্তিটির জন্য দ্রষ্টব্য তাপস বসু, 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার', ছাত্র সংগ্রাম, পৃঃ ৯।

(৯৮) কবির 'রাশিয়ার চিঠি'র (পঞ্চম পত্র) জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীমন্ত কুমার জানা, তদেব, পৃঃ ১৪৯।

(৯৯) কবির এই বক্তব্যটির জন্য দ্রষ্টব্য সুজন চক্রবতী, তদেব, পৃঃ ১৭।

(১০০) কবির এই উক্তিটির জন্য দ্রষ্টব্য তাপস বসু, তদেব, পৃঃ ৪।

(১০১) প্রসঙ্গক্রমে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ পুঁজিবাদ (capitalism) বলতে বোঝায় পুঁজি (capital) বিনিয়োগ করে উত্তরোত্তর মুনাফা লাভের প্রয়াস মূলক ব্যবস্থা। অর্থাৎ কোন দেশের পুঁজিপতিরা (অর্থাৎ শিল্পপতি ধনী-ব্যাঙ্কররা) যখন নিজেদের সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়, মূলতঃ তখনই পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে। কল-কারখানা স্থাপন করে সেখানকার উৎপাদন কাজে পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের ব্যাপারটিই তাই আধুনিক পুঁজিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর কলকারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করার বুর্জোয়া মানসিকতার মধ্য দিয়েই পুঁজিপতি মিল-মালিকের শোষণের জোয়াল চেপে বসে শ্রমিকদের উপর। ফলে মালিকের বাড়তি মুনাফার স্বার্থে শ্রমিকদের বাড়তি শ্রম করতে হয়, এবং তা করতে হয় শোষণের চাপে বাধ্যতামূলক ভাবেই। আর শ্রমিকদের বাড়তি শ্রমের বিনিময়ে যে উদ্বৃত্ত

মূল্য (Surplas value=কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রকৃত ব্যয় বাবদ অর্থকে দ্রব্যটির বাজারে বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বা মূল্য থেকে বাদ দিলে যে অবশিষ্ট অংশ বা অর্থ থাকে তাকেই উদ্বৃত্ত মূল্য বলে) অর্জিত হয়, সেই মূল্যের কোন অংশ বা ভাগই শ্রমিকরা পায় না ; এই উদ্বৃত্তমূল্য যায় মালিকের ভাণ্ডারে। এইখানেই নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার শোষণের মূল চাবিকাঠিটি। সুতরাং পুঁজি বিনিয়োগ—শ্রমিক শোষণ—বাড়তি মুনাফা বা উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগ-দখল—এদের পথ ধরে পুঁজিবাদ দৃঢ় হয়ে ওঠে।

আর সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) হল মূলতঃ এই পুঁজিবাদের গণ্ডী পেড়িয়ে বিদেশে বা অপর সাম্রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রয়াস মূলক ব্যবস্থা। অর্থাৎ কোন দেশের পুঁজিপতি যখন নিজের দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে ঈপ্সীত মুনাফা অর্জন করতে পারে না এবং সেই কারণেই সে যখন তার পুঁজিকে অন্যদেশে বা অন্য সাম্রাজ্যে বিনিয়োগ করতে শুরু করে ও বাড়তি মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদ গড়ে ওঠে। এইভাবে এক দেশের পুঁজিপতির পুঁজি অন্য দেশে খাটতে থাকার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে এক দেশের উপর অপর দেশের সর্বময় অর্থনৈতিক আধিপত্যের রূপ লাভ করে। আর এই অর্থনৈতিক আধিপত্য তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এই আধিপত্য-ভোগী দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্যও অধীনত দেশটির উপর স্বাভাবিকভাবেই চেপে বসে এবং তখনই সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ভারতস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বলেছেন যে এখানে "বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড" হয়ে দেখা দিয়েছে ; অর্থাৎ ব্যবসায়ের খাতিরে নিছক বণিকের বেশে ভারতবর্ষে এসে ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে ভারতের অর্থনীতিকে করতলগত করে, এবং এর মাধ্যমেই ভারতের শাসন-ক্ষমতাও তারা দখল করে নেয়। এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদ (ভারতে) দৃঢ় হয়ে ওঠে।

সুতরাং পুঁজিবাদ যখন অচল হয়ে প'ড়ে আর এগোতে পারেনা অর্থাৎ পুঁজিপতির বাড়তি মুনাফা যোগাতে পারে না, তখনই সেই মুমূর্ষু পুঁজিবাদের (decaying capitalism) বুক ভেদ করে বেড়িয়ে আসে সাম্রাজ্যবাদ। এক কথায়, পুঁজিবাদের শেষ ধাপ থেকেই অর্থাৎ পুঁজিবাদ কোন দেশে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়ে ক্রমশঃ অচল বা অ-কার্যকর হয়ে উঠলে তখনই আসে সাম্রাজ্যবাদ। তাই সাম্রাজ্যবাদের ধারণার জনকপ্রতীম চিন্তাবিদ্ লেনিন বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর" ('Imperialism is the highest stage of capitalism')

বলাই বাহুল্য, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবেই শোষণ-পীড়ন ও বঞ্চনা ডেকে আনে—একটি আনে স্বদেশে, অপরটি আনে বিদেশ-বিশ্বে। ফলে সমাজে অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বৈরাচার আর শক্তি-মত্ততার পথ প্রশস্ত হয়। ধনী পুঁজিপতি মানুষের সর্বময়-কর্তৃত্বের উদগ্র আকাঙ্খার দাপটে সমগ্র সমাজ বিষিয়ে ওঠে। সমাজ-জীবন তখন কলুষিত হয়ে ওঠে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী ভয়াল পরিণতি।

(১০২) অমরেশ মুখার্জী, 'রবীন্দ্র কাব্যে সাধারণ মানুষ', নীতা হালদার সম্পাদিত পল্লীস্বর, কলতা, এপ্রিল, ১৯৮৬, পৃঃ ৮।

(১০৩) তাপস বসু, তদেব, পৃঃ ৭।

(১০৪) ৫৯ নং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১০৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট', পৃঃ ৪১০।

(১০৬) তদেব।

(১০৭) কবির 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য মইনুল হাসান', তদেব, পৃঃ ১১।

(১০৮) কবির এই উক্তিটির জন্য দ্রষ্টব্য মইনুল হাসান, তদেব, পৃঃ ১২।

(১০৯) কবির 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য দেবাশিস্ চক্রবর্তী ও প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ২৩।

(১১০) শোষণ-পীড়নের অবসানান্তে যে সুস্থ, নির্ভয়, নিশ্চিত, সুখী সমতাভিত্তিক

সমাজের কথা কবি কল্পনা করেছেন, কবি-কল্পিত সেই মানবিকতাসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থার কথা আমরা পরে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আলোচনা করব। এরজন্য পরবর্তী ১৩৮ নং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১১১) ৯৬ নং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট', পৃঃ ৪১০।

(১১৩) শ্রীমন্ত কুমার জানা, তদেব, পৃঃ ১৪৯।

(১১৪) কবির 'রাশিয়ার চিঠি'র (পঞ্চম পত্র)। এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীমন্তকুমার জানা, তদেব, পৃঃ ১৪৯।

(১১৫) মিস্ র‍্যাথবোনকে লিখিত কবির পত্রটির এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য দেবাশিস্ চক্রবর্তী ও প্রত্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব পৃঃ ২৫।

(১১৬) কবির 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য দেবাশিস্ চক্রবর্তী ও প্রত্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব পৃঃ ২২।

(১১৭) তদেব।

(১১৮) ১১০ নং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট', পৃঃ ৪১০।

(১২০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায়তের কথা গ্রন্থের 'ভূমিকা'। দ্রষ্টব্য প্রমথ চৌধুরী, তদেব, পৃঃ ৬-৭।

(১২১) মিঃ এ্যাণ্ড্রুজকে লিখিত কবির পত্রের এই অংশটির জন্য দেবাশিস্ চক্রবর্তী ও প্রত্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ২৩-৪। বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত।

(১২২) ৭৮ নং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১২৩) স্পেনীয় গণতন্ত্রের উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে কবির প্রতিক্রিয়া ও স্পেনকে সাহায্য দানের আবেদনমূলক পত্রটির এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য দেবাশিস্ চক্রবর্তী ও প্রত্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ২৪। বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত।

(১২৪) মইনুল হাসান, তদেব, পৃঃ ১৪।

(১২৫) জাপানী কবি নোগুচিকে লিখিত কবির পত্রের এই অংশটির জন্য দ্রষ্টব্য দেবাশিস্ চক্রবর্তী ও প্রত্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ২৪। বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত।